নীহাররঞ্জন গুপ্তর রহস্যঘন গল্প

পক্ষিরাজ

সম্পাদক: প্রেমেন্দ্র মিত্র

জ্যৈষ্ঠ '৮৮ জুন '৮১

বিষাক্ত তীর

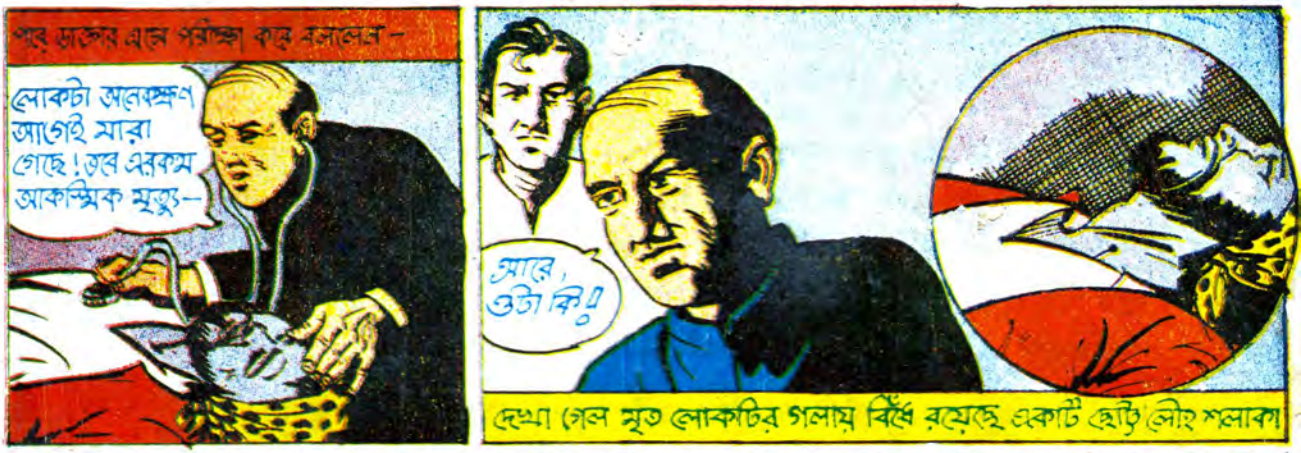

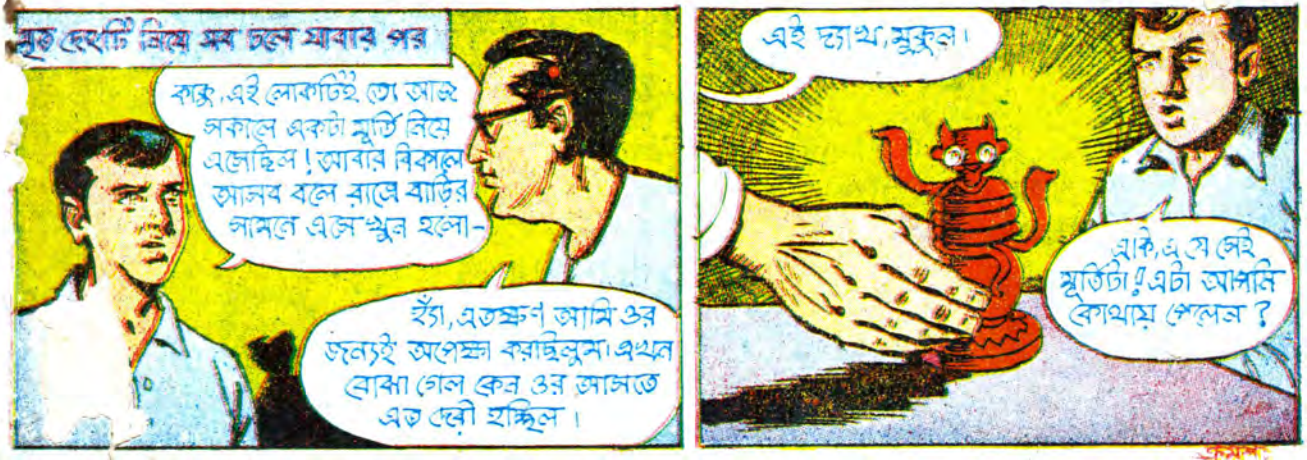

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

—ঃ নিয়মিত পক্ষিরাজ পাবার নিয়ম ঃ—

এক বাংলা মাসের ৯ই তারিখে কাছের কোন বই স্টলে অথবা হুইলার্স'এর স্টলে খোঁজ করলেই 'পক্ষিরাজ' পাওয়া যায়। দাম প্রতি সংখ্যা দুই টাকা। শারদীয়-সংখ্যার দাম পৃথক।

দুই গ্রাহকরা ঘরে বসেই ডাক যোগে 'পক্ষিরাজ' পায়। এজন্য ডাক-মাশুল দিতে হয় না। ১২ মাসের গ্রাহক হলে ২৪ টাকা বৈশাখে গ্রাহক হলে ২২ টাকা (বৃহদাকার পূজো সংখ্যা সহ); ৬ মাসের গ্রাহক হতে ১২ টাকা লাগবে। শারদীয় সংখ্যা রেজিস্ট্রি-ডাকে পাঠানোর জন্য বাড়তি ৩ টাকা দিতে হবে। হাতে নিলে লাগবে না। টাকা হাতে, মানি-অর্ডারে অথবা কলকাতার কোন ব্যাঙ্কের উপর ড্রাফট পাঠাতে হবে ('PAKSHIRAJ'—এই নামে ড্রাফট হবে)

তিন যারা গ্রাহক আছেন তাদের রিনিউ করার জন্য ২২ টাকা পাঠালেই চলবে। (২৪ টাকা নয়)।

চার নতুন লেখকদের লেখা প্রকাশের সুযোগ আছে। 'লেখা' এক পৃষ্ঠায় লিখে পাঠাতে হবে। তোমাদের পাতায় লেখা, আঁকার জন্য গ্রাহক নং ও 'বয়স' উল্লেখ করতে হবে। নইলে নির্বাচনে অসুবিধা হয়। লেখা মনোনীত হল কিনা জানানো এবং অমনোনীত লেখা কোন অবস্থাতেই ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। তাই কপি রেখে লেখা পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

পাঁচ ধাঁধা, ভেবে ভেবে সমাধান প্রভৃতির উত্তর এবং একাধিক প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই পৃথক পৃথক কাগজে লিখে পাঠাতে হবে। বিভাগীয় এবং যথাযথ প্রশ্ন ছাড়া উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। ডাকে প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে রিপ্লাই কার্ড অথবা উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠাতে হবে।

ছয় ইস্কুল কলেজ ক্লাব লাইব্রেরী বুক-স্টল যে কোন প্রতিষ্ঠান ৩০ পয়সার ডাক টিকিট সহ লিখলে নমুনা কপি পাঠানো হবে।

—ঃ যোগাযোগ কেন্দ্র ঃ—

৩৮।বি সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট

কলকাতা ৯

ফোন ঃ ৩৪-৩১৪৬

—ঃ বিক্রয় কেন্দ্র ঃ—

সাকসেস পাবলিশিং হাউস

১ বিধান সরণী

কলকাতা ৭৩

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রিকা
নং ৫৫২/১ (১৩) টি. বি. সি.   তারিখ ২০/৫/৮০

৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৮, জুন '৮১

ছোটদের মনের মতন অভিনব মাসিক পত্রিকা

চিত্রে গল্প	ময়দানবের দ্বীপ/প্রেমেন্দ্র মিত্র	১২
	বিষাক্ত তীর/নীহাররঞ্জন গুপ্ত	১
	চুনোপুঁটি/দিলীপ দাস	১৮
ছড়া ও কবিতা :	সৎ-পরামর্শ/বিমল ঘোষ (মৌমাছি)	৫
	মামুনের খেলা/কাজী মুরশিদুল আরেফিন	৫
	ইচ্ছে···!/নরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩০
বিশেষ রচনা :	সংবাদ-বিচিত্রা/বিশ্বামিত্র	২৪
	বিশ্বরেকর্ড/ঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	২৯
বিশেষ বিভাগ :	আঁকি বুকির খেয়াল খাতা	৪
ধারাবাহিক উপন্যাস :	সবুজ পাতা লাল ধুলো/নীহাররঞ্জন গুপ্ত	৯
গল্প :	কুকুর প্রদর্শনী/তারাপদ রায়	৭
	ভূতের উপর মামদোবাজী/বিনয়ভূষণ ভৌমিক	১৯
	গোল গোল গণ্ডগোল/কালীকিংকর কর্মকার	১৫
কার্টুন :	পিকলু/পরিচয় গুপ্ত	২৫
ম্যাজিক :	এস ম্যাজিক শেখাই/পি. সি. সরকার জুনিয়র	২৩
ধাঁধা :	ধাঁধা ও ধাঁধার উত্তর	৩০
প্রতিযোগিতা :	তুলি সাহিত্য প্রতিযোগিতার ছড়া ও ফলাফল	৬/১১
	ভেবে ভেবে সমাধান ও উত্তর	৩২
	বলো তো ?	৩৪
খেলা :	ছেলেবেলার গল্প/শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	২৬
	যোগাসন/যোগী	২৮
হাতের কাজ :	কাগজের সারুগাছ/মঞ্জুদি	৩১
তোমাদের পাতা :	আগামীকালের লেখকদের আসর	৩৩

সম্পাদক : **প্রেমেন্দ্র মিত্র**

অলংকরণ : **দেবাশিস দেব**

দাম : **এক টাকা**

বিক্রয় কেন্দ্র : **সাক্সেস্ পাবলিশিং হাউস.** ১ বিধান সরণী, কলিকাতা ৭৩

বিমান মাশুল ॥ ত্রিপুরা ১৫, পয়সা পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

সোকা পিলজা-র

আঁকি বুকির খেয়াল খাতা

থাকুক কিংবা নাইবা থাকুক পয়সা,
ঘৃত খেলে, গব্য খাবে,
কখ্খনো নয় ভয়সা।

কিন্তু জেনো বস্তুবাদী চার্বাক
মোটেই তেমন নয়'ক প্রাজ্ঞ,
যতটা তাঁর নাম ডাক।

ঋণং কৃত্বা খাও যদি ঘি
ক্রুদ্ধ উত্তমর্ণ
হয়ত কোথাও ধরবে কষে
তোমার একটি কর্ণ।

তাই বলে কি ছাড়বে ঘৃত
হয় যদি তা গব্য ?
কখ্খনো না। পড়ে দেখো
ন্যায়শাস্ত্র নব্য।

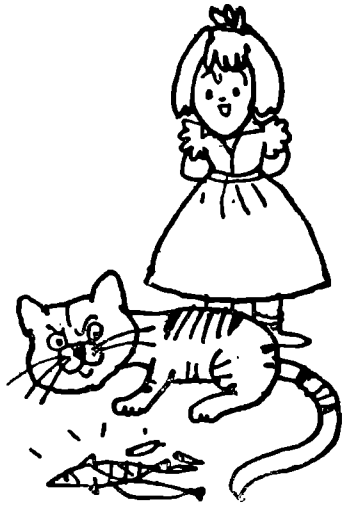

সৎ পরামর্শ

বিমল ঘোষ (মৌমাছি)

দাদাগো দাদা বাজার যাবে ?
বাজার গিয়ে কীইবা পাবে !
বাজার শুধু নামেই আছে
সওদা-পাতি চড়ল গাছে !

মাছের বদল আঁশ আর কাঁটা
সব্জী কচু ঘেঁচুর ডাঁটা
চার ছ'টাকা কেজি দরে
ঐ ভুষি মাল আনবে ঘরে।

আনলে পরে কেউ কি খাবে।
টুটুল টুসী মুখ বেঁকাবে !
ছোঁবেনা তা ভুলো হুলো !
নষ্ট শুধুই পয়সাগুলো !

তার চেয়ে ভাই কাটো ঘাস,
ঘাস জুটবে বারো মাস।
গরু ছাগল ঘাসটা খাবে।
দুধটা তাদের তুমিই পাবে।

টুটুল খাবে টুসীও খাবে
আমিও খাবো, তুমিও খাবে
দুধ ভাত রোজ পেলে খেতে
হবেনা আর বাজার যেতে।

মামুনের খেলা

কাজী মুরশিদুল আরেফিন

ঘরের ভেতর খেলছে একা
ছোট্ট মেয়ে মামুন,
হাতটা তুলে বলছে দেখি
থামুন মশাই থামুন।

ঘরের ভেতর থামবে কে আর,
কোথায় বা কোন গাড়ি ?
ট্র্যাফিক পুলিশ সেজে মামুন
মাতিয়ে রাখে বাড়ি।

এদিক ওদিক থামছে গাড়ি,
ভাঙছে কে-কে আইন ?
নোটবুকেতে হিসেব রেখে
করতে হবে ফাইন।

অন্ধ-খোঁড়া মানুষ যাবে
এধার থেকে ওধার,
তাইতো মামুন হাতটা ধ'রে
করছে তাদের পার।

লাল আলোটা জ্বললে ঘরে
মামুন তোলে হাত,
ঘুমের ঘোরে পুলিশ সেজে
কাটায় সারা রাত।

দিনের বেলা খেলনা-গাড়ি
চালায় নিজে মামুন,
আইন ভেঙে চললে বলে
থামুন মশাই থামুন।

॥ তুলি সাহিত্য প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত ছড়া ॥

নয় গো প্রতিবন্ধী

সুদেব বক্সী

চোখের আলো ফুরিয়ে গেলে, হৃদয়কে চোখ ভাবব—
হৃদয় দিয়ে দেখব জগৎ, লিখব হাজার কাব্য।
মহাকবি জন্ মিলিটন্ লিখেছিলেন পদ্য
চোখ হারিয়ে হৃদয় আলোয় রাঙিয়ে যাওয়া সদ্য।
অবলম্বন হারিয়ে গেলেও মূক-বধির এই প্রানটা
হৃদয় দিয়ে উঠবে গেয়ে শুনবে ভবের গানটা ;
বধির ও মূক বেঠোভেন সুরের কারুকার্যে
মাতিয়ে দিলেন সবার মন শিখব সেটা আজ যে
অন্ধ কিংবা বধির হলে কিছুই এসে যায় কি ?
মনের আলোয় উপছে পড়ার উপায় কোন নেই কি ?
অন্ধ, বধির মহিয়সী হেলেন কেলারই
দেখিয়েছিলেন পঙ্গু হলে ও নয় তো ফেলারই।
পঙ্গুতার কারাগারে হয় না তো কেউ বন্দী,—
হৃদযন্ত্র থাকলে সঠিক, নয় গো প্রতিবন্ধী।

॥ তুলি সাহিত্য প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত ছড়া ॥

ছোটাছুটি

মমতা দে

কাঠঠোকরার ঠোঁটটি মোটা
শুধুই ঠোকে কাঠে,
ছেলেরা সব ব্যস্ত বেজায়
খেলতে ছোটে মাঠে।
একটা শালিখ দেখতে নেই
তাই খুঁজছি দুটি,
পাচ্ছিনাকো কোথাও খুঁজে
শুধুই ছোটাছুটি।

কুকুর প্রদর্শনী

তারাপদ রায়

অল্প বয়েসে কবিতা লিখে অল্পস্বল্প নাম করেছিলেন পরেশবাবু, মানে পরেশচন্দ্র পাল। 'ধূম্রলোচন' নামে একটা কবিতার বইও বেরিয়েছিলো তাঁর। সে সব অনেককাল আগেকার কথা। তারপর তিরিশ বছর চলে গেছে।

সরকারি চাকরি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে চলে গিয়েছিলেন পরেশবাবু, ক্রমশঃ সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। ধীরে ধীরে কবিতা লেখাও ছেড়ে দেন।

সেই পরেশবাবু অনেকদিন পরে এবার বড়দিনের ছুটিতে কলকাতায় এসেছেন। আর মাত্র পাঁচ-সাত বছর তাঁর চাকরি আছে, তারপর রিটায়ারের পর তাঁর খুব ইচ্ছে কলকাতায় এসে বসবাস করবেন। প্রথমত সেই সব খোঁজখবর করতেই পরেশবাবুর এবার কলকাতায় আসা।

কলকাতায় এসে ভবানীপুরে মামাতো ভাইয়ের বাড়িতে উঠেছেন পরেশবাবু। পরেশবাবু নিজে প্রায় ভুলে গেছেন যে একসময় তিনি কবিতা লিখতেন কিন্তু তাঁর এই মামাতো ভাই সদাশিব রায় এখনো সেকথা ভালোই মনে রেখেছে।

বড়দিনের সময় কলকাতার চারদিক নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও জমজমাট। নাচ-গান, আলো-বাজনা, মেলা-ফাংশন, নানা উৎসবের মধ্যে ডগ-শো বা কুকুর প্রদর্শনীও আছে। পরেশ পাল মশাই নিজে যে খুব কুকুর প্রেমিক তা কিন্তু নন। বরং বলা উচিত তিনি কুকুর-টুকুর বেশ অপছন্দই করেন। কিন্তু মামাতো ভাই সদাশিববাবু কুকুর বলতে পাগল. এবছর আবার তিনি একটা কুকুর প্রদর্শনী কমিটির সম্পাদক হয়েছেন। তাঁর খুব ইচ্ছে এবারের কুকুর প্রদর্শনীটি খুবই অভিনব এবং উল্লেখযোগ্য করে তোলেন। সদাশিববাবুর মাথায় কিছুদিন ধরেই নানা ফন্দি ঘুরপাক খাচ্ছিলো, এখন হঠাৎ পিসতুতো ভাই কবি পরেশচন্দ্র পাল এসে যাওয়ায় তিনি যেন হাতে চাঁদ পেলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন এবারের কুকুর প্রদর্শনীর সুভেনিরটি কবিতায় ভরিয়ে দেবেন। শুধু কবিতা আর কবিতা, কবিতা আর কুকুর, কুকুরের বিষয়ে কবিতা দিয়ে ভরিয়ে দিতে হবে ষোল পাতার বইটি।

প্রস্তাব শুনে পরেশবাবুতো আকাশ থেকে পড়লেন, বলে কি সদাশিব, কুকুরের উপরে কবিতা, তাও একটা দুটো নয় রাশি রাশি। তিনি সদাশিববাবুকে অনুনয় করে বললেন, 'ভাই, কয়েকদিন শান্তিতে থাকতে এলাম। এ কি বিপদে ফেলছো। আর তাছাড়া কুকুর আমার দুচোখের বিষ আর কবিতা লেখা সে কবে জলাঞ্জলি দিয়েছি। তুমি আমাকে দয়া করে মাপ করে দাও, সদাশিব।'

কিন্তু কে শোনে কার কথা? সদাশিববাবু নাছোড়বান্দা, তাঁর হাত ছাড়ানো পরেশবাবুর পক্ষে অসম্ভব। সদাশিববাবু বললেন, 'পরেশ, তোমার মত কৃতী ভাই থাকতে ডগ্ শো'র ইতিহাসে আমি একটা নতুন দিগন্ত আনতে পারবো না, এ হতে পারে না। পরেশ তুমি ভুলে যেওনা আমি তোমার আপন মামাতো ভাই।'

যাঁর বাড়িতে এসে উঠেছেন তাঁর অনুরোধ অগ্রাহ্য করা

শেষ পর্যন্ত সম্ভবপর হলো না পরেশবাবুর পক্ষে। তিনি আত্মসমর্পন করলেন, তিরিশ বছর পর আবার মাথা গুঁজে লিখতে লাগলেন কবিতা। কিন্তু এখন আর সেই অল্প বয়েসী পরেশচন্দ্র পালের চাঁদ, ফুল বা কোকিল নিয়ে কবিতা লেখা নয়, এমন কি বিপ্লব, বিদ্রোহ বা জনগনের কবিতাও নয়—এবার প্রবীণ পরেশচন্দ্রকে অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লিখতে হচ্ছে কুকুরের উপর কবিতা।

সদাশিববাবুর সারা বাড়ি ছেয়ে গেলো অসম্পূর্ণ এবং অপছন্দ কবিতার টুকরোয়। যা লেখেন প্রায় কিছুই পছন্দ হয় না পরেশবাবুর, তিনি অতীতের খ্যাতনামা কবি, তাঁর পক্ষে তো আর যাতা লেখা সম্ভব নয়। তাই মেঝেতে, বারান্দায়, সিঁড়িতে উঠতে লাগলো ছেঁড়া কবিতার টুকরো। এই এখানে খাটের নীচে পড়ে রয়েছে দু লাইন ঃ—

শেয়াল মারির জঙ্গলে।
কুকুর থাকে দলে দলে ॥

আবার ওদিকে বারান্দায় ফর ফর করে উড়ছে ঃ—

সারমেয়, কুকুর আর কুত্তা।
কলকাতা মানেই কালকুত্তা ॥

কবিতা লেখার ব্যাপারে যথাসাধ্য সাহায্য করছেন পরেশ-বাবুকে সদাশিববাবু। কুকুরের নাম-ধাম, স্বভাব-চরিত্র সব ছবি দেখিয়ে দেখিয়ে পরেশবাবুকে বুঝিয়ে যাচ্ছেন তিনি, যাতে লেখার সময় কোনো অসুবিধে না হয়।

মামাতো-পিসতুতো দুই ভাইয়ে মিলে বহু আলোচনা করে ঠিক করেছিলেন সুভেনিরটির নাম দেওয়া হবে, 'সারমেয় সংহিতা'। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দুজনেই বুঝলেন নামটা খুবই খটমট, সাধারণ দর্শক যারা ডগ্ শো দেখতে আসবে তারা এতো কঠিন নাম না'ও বুঝতে পারে। অবশেষে আরো বহু চিন্তা করে, কথাবার্তা বলে খুব সোজা একটা নাম দেওয়া হলো পুস্তিকাটির, 'কুকুর ও কবিতা।' বেশ আধুনিক নাম, পরেশবাবুর বেশ পছন্দ হলো, বেশ কবিতা-কবিতা মেজাজ আছে নামটির মধ্যে।

বইটির প্রচ্ছদ পরিকল্পনাও করলেন পরেশবাবু নিজেই। মলাট ভর্তি নানা জাতের, নানা আকারের কুকুরের ছবি, তার উপরে লাল অক্ষরে গোটা গোটা লেখা, 'কুকুর ও কবিতা।' প্রচ্ছদের ঠিক মধ্যখানে একটা বিরাট কুকুরের মুখ, সেই মুখের মধ্যে লেখা,

ডগ্ শো।
একাই একশো ॥

প্রচ্ছদের সবচেয়ে নীচে লেখা, সেও বেশ বড় বড় হরফে গাঢ় নীল কালি দিয়ে ঃ—

পরিকল্পনা—শ্রীসদাশিব রায়।
রচনা ও সম্পাদনা—শ্রীপরেশচন্দ্র পাল।

অবশ্য সদাশিববাবু বা পরেশবাবু শুধু আত্মপ্রচারই করেছেন এই কুকুরের চাইতে, একথা যদি কেউ ভেবে বসে তবে অন্যায় ভাবা হবে। প্রথম পৃষ্ঠার শুরুতে চমৎকার ভূমিকা, হয়তো একটু ছন্দ ভুল কিন্তু অবশ্যই হৃদয় গ্রাহী ঃ

ডগ্-ডগ্, ডগ্-ডগ্।
ডগ্-ডগ্, ডগ্-মগ ॥
ডগ্-ডগ্ ডগ্ শো।
কুকুরের সংখ্যা দশ শো ॥

এর পরে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা কুকুরের ছবি তার কবিতা। এই পৃথিবীতে কত রকমের যে কুকুর আছে তার ইয়ত্তা নেই, পরেশবাবুর এ সম্বন্ধে এর আগে কোনো ধারণাই ছিলো না। নাক থ্যাঁবড়া কুকুর তার নাম হলো গাগ, সাদা-কালো ছিট ছিট লম্বা জাতের কুকুর ডালমেশিয়ান, সবচেয়ে ভদ্র আর নরম চেহারার কুকুরের বুক ঠান্ডা করা ভয় জমানো নাম ল্যাউহাউন্ড। তাছাড়া নানা দেশের নামে নাম আরো জাতের কুকুরের, পিকিংইজ, নিউফাউন্ড-ল্যান্ড, নরওয়েজিয়ান। সেই সঙ্গে রয়েছে সকলেরই বহুচেনা এ্যালসেশিয়ান, পুডল এবং রকমারি দোআঁশলা কুকুর।

কারোকেই অবহেলা করেননি পরেশচন্দ্র পাল। দু চার লাইন সকলকে নিয়েই লিখেছেন, দু একটিতো চমৎকার। যেমন হাউন্ড নিয়ে সামান্য দুলাইন কিন্তু তাইই অসামান্য ঃ—

লাউ হাউ হাউ হাউন্ড
কুকুরগুলির সাউন্ড ॥

কিংবা টেরিয়ার নিয়ে একটা পুরনো কবিতার কায়দায় লিখেছেন,

সুখী পরিবার।
শোভে টেরিয়ার ॥

কিন্তু এই সামান্য সুভেনিরকে সত্যিই অসামান্য করেছে, একে সাহিত্য মূল্য দিয়েছে এ্যালসেশিয়ান ডালমেশিয়ান কবিতাটি। সেই কবিতার শেষ অংশটুকু দিয়ে এই রচনা আপাতত শেষ করছি, কিন্তু পাঠক-পাঠিকাদের কাছে অনুরোধ এবারের ডগ্ শো থেকে এই 'কুকুর ও কবিতা' সুভেনিরটি সংগ্রহ করতে ভুলো না।

এ্যালসেশিয়ান ডালমেশিয়ান কবিতার শেষাংশ ঃ—

এ্যালসেশিয়ান ডালমেশিয়ান।
টানা বারান্দা সাজানো বাগান ॥

(এর পর ১১ পাতায়)

॥ চোদ্দ ॥

দৈত্যের মত চেহারার লোকটা কথাটা বলে অন্য দিকে তাকিয়ে আপন মনে কি যেন চিবুতে লাগল। বিরূপাক্ষ সেন চেয়ে আছে লোকটার দিকে, কি চিবুচ্ছে লোকটা ? মনে হয় চিউংগম।

লোকটার হাভভাব দেখে মনে হয়—ঘরের মধ্যে যে আর কেউ আছে সেটা যেন মনে হচ্ছে না।

বিভূতি সেনের প্রচণ্ড রাগ হয় লোকটার পরে।

পুলিশী মেজাজ তার ; ইচ্ছা করে উঠে ঐ নাম্বার ওয়ান ক্রিমিন্যালটার গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয়। কিন্তু আজকালকার দিনে পুলিশকে আদেশ সংযত ব্যবহার করতে হয়।

নেহি। লেকেন উয়ো কৌন হ্যায়—

ঠাকুর জার্নাল সিংয়ের নাম শোননি কখনো ?

নেহি।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো বিভূতি সেন। বললে, ঝুট ! তুই মিথ্যা কথা বলছিস।

শুনিয়ে বাবু, আমি তোমাদের ঐ জার্নাল ফার্নাল সিং নামে কাউকে চিনি না। জীবনে কখনোও নাম শুনিনি।

হুঃ। বিরূপাক্ষ এবার বললে, তোমার দেশ কোথায় ?

মধ্যপ্রদেশে—

এখানে এই কলকাতা শহরে কতদিন আছো ?

তা দোশাল হয়ে গেল।

ফিয়ার্স লেনের বাড়িটায় তুমি থাকতে

তাছাড়া লোকটার মুখ থেকে কথা বের করতে হবে তাকে, ধৈর্য হারালেও চলবে না।

বিরূপাক্ষই এবার বলেন, তুমহারা নাম জগমোহন, নেইত কেয়া নাম তুমহারা ?

হামারা নাম বনোয়ারী—

বনোয়ারী।

হ্যাঁ—বনোয়ারী লাল। লোকটা আবার বললে, ঠাকুর জার্নাল সিংকো তুম জানতে হো।

জার্নাল সিং—

হাঁ। জানো তাকে ?

নেহি।

জানো না ?

না। ও বাড়িতে একটা কাজে এসেছিলাম। তোমাদের লোকরা গিয়ে ঝুট মুট আমাকে ধরে এনেছে।

কি কাজে এসেছিলে ফিয়ার্স লেনের বাড়িতে—কার কাছে এসেছিলে ?

ওখানে সিংজী বলে একটা আদমী থাকে—

সিংজী—

হাঁ। তার কাছে এসেছিলাম।

কেন ?

তার কাছে কিছু টাকা পাওনা আছে আমার সেই টাকা নিতে—

টাকা পেয়েছো ?

না।

কত দিন সিংজীর সঙ্গে তোমার পরিচয় ?

তা সাত আট মাসত হবেই।

জার্নাল সিং নামে তাহলে তুমি কাউকে চেনো না বনোয়ারী লাল।

না।

এখানে এই শহরে কি কর তুমি ?

আমার একটা গেহঁ পিষবার কল আছে—আমহার্ষ্ট স্ট্রীটে।

আর কে আছে তোমার

আমার কেউ নেই, আমি একেলা।

থাক কোথায় ?

ঐ দোকানেই।

বিরূপাক্ষ চোখের ইশারায় বিভূতি সেনকে যেন কি বললে। বিভূতি সার্জেন্টের দিকে চেয়ে ইংগিত করলো—

লোকটাকে হাজত ঘরে নিয়ে যাবার জন্য।

সার্জেন্ট বনোয়ারীকে বললে, চল—

আমাকে ছেড়ে দেবেন না। বনোয়ারী বললে।

সার্জেন্ট জবাবে বললে, চল—চল।

বনোয়ারী একবার রোষ কষায়িত লোচনে বিরূপাক্ষ ও বিভূতি সেনের দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

বিরূপাক্ষ বললে, সহজে ওর মুখ থেকে কথা বের করতে পারবে না বিভূতি।

তাহলে—

আপাততঃ ও লক আপেই থাক—দুটো তিনটে দিন। বিরূপাক্ষ বললে।

মিঃ সেন—

বল।

তোমার কি মনে হয় লোকটা সত্য বলছে।

না। তাছাড়া বনোয়ারী ওর নাম কস্মিন কালেও নয়—তবে

ওর নাম জগমোহনই—তুমি লক্ষ্য করোনি বিভূতি—ওর বা হাতে উলকিতে লেখা আছে 'জগমোহন'—

সত্যি।

হ্যাঁ—আর এও আমার ধারণা—ও ঠাকুর জার্নাল সিংকে চেনে—ভাল করেই চেনে, নাহলে নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটা চমকে উঠতো না। সে যাক—ফিয়ার্স লেনের বাড়িটার 'পরে সর্বদা কড়া নজর রেখো—কারণ ওটাই সিংজীর প্রকৃত আড্ডা—আস্তানা। ও আপাততঃ যেখানেই পালাক আমার মন বলছে—আবার ও আসবে ঐ আড্ডায়।

আসতে সিংজীকে আড্ডায় হবেই—

কিসে বুঝলে সে আবার ওখানে আসবেই—

আসবে মোহন সিংয়ের খোঁজে—কারণ একমাত্র মোহন সিংই জানে ঠাকুর জার্নাল সিংয়ের একমাত্র ছেলে বিল্লু কোথায়। ঐ বিল্লুরই সন্ধানে জার্নাল সিং এ শহরে এসেছে।

সিংজীই কি তবে আসলে ঠাকুর জার্নাল সিং—

হতেও পারে—নাও হতে পারে—বিরূপাক্ষ বললে।

ওদের কথা শেষ হলো না—একটা রোগা পটকা লোক একজন সার্জেন্টের সঙ্গে এসে অফিস ঘরে ঢুকল।

একে—সার্জেন্ট শিকদার ? বিভূতি সেন প্রশ্ন করে।

রোগা—লম্বা—চেহারা লোকটার—

পরণে পায়জামা ও পাঞ্জাবী—মাথায় একটা পাগড়ি।

পায়ে নাগরা।

ইয়া গোঁফ।

স্যার—সার্জেন্ট শিকদার বললে, লোকটা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়—

কেন কি ব্যাপার ?

ও যা বলবার আপনাকেই বলতে চায়—

হুঁ। কি নাম তোমার—

আমি ইনেসপেকটার বিভূতি সেনের সঙ্গে কথা বলতে চাই—হিন্দিতে কথাগুলো বললে লোকটা।

কি নাম তোমার।

মাধো সিং—

কোথা থেকে আসছো—

আমি ঐ ফিয়ার্স লেনের বাড়িতেই থাকি—কাল রাতে যেখানে আপনারা রেইড করেছিলেন।

তুমি সিংজীকে চেনো।

কে সিংজী ?

সিংজী নামটা শোন নি—

না সাহেব—সিংজী বলে কাউকে আমি চিনি না। মাধো সিং বললে।

বিরূপাক্ষর মুখের দিকে তাকায় বিভূতি সেন।

জগমোহনের নাম শুনেছো ?

কে জগমোহন

হীরা সিংকে চেনো

হীরা সিং—সে কে ! মাধো সিং বললে।

ফিয়ার্স লেনের ঐ বাড়িটায় থাকো—ওদের কারো নাম তুমি শোননি ?

না।

তবে ওখানে কে—কারা থাকে—কাউকে তুমি চেনো

চিনি বৈকি—মনোহর সিং—তার প্রায় অন্ধ বুড়ি মা—একটা ছোট্ট মেয়ে থাকে লতা—লতার বাবা ব্রজেন্দ্র—

আর কারা থাকে ঐ বাড়িতে—

আরো ত অনেকেই থাকে—সকলকে আমি চিনি না।

মাধো সিং—

হুজুর—

তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছো কেন—

আপনি নিশ্চয়ই লক্ষণ সিংয়ের নাম শুনেছেন—

লক্ষণ সিং—

হ্যাঁ—সে ঐ ফিয়ার্স লেনের বাড়িতে থাকে—

কে সে ? কি করে—

সে একটা ডাকু—

ডাকু !

হ্যাঁ—পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ঐ ফিয়ার্স লেনের বাড়িতে গা ঢাকা দিয়ে আছে—

(ক্রমশঃ)

তুলি সাহিত্য প্রতিযোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত ছড়া দুটি এবং তৃতীয় হইতে দশম স্থানাধিকারীদের নাম প্রকাশ করা হল। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানাধিকারীদের ছড়াও প্রকাশ করা হবে।

তৃতীয় : রামকৃষ্ণ দে, বড় আন্দুলিয়া, নদীয়া।

চতুর্থ : সুজিত দে, চকবাজার, বাঁকুড়া।

পঞ্চম : জয়ন্তকুমার সেনগুপ্ত, নবাবগঞ্জ, ইছাপুর।

ষষ্ঠ : অঞ্জলি দে, কলকাতা ১৪।

সপ্তম : মনোজকান্তি ঘোষ, উদয়রাজপুর, ২৪ পরগণা।

অষ্টম : মৃদীপ্ত নায়াক, ভোগপুর, মেদিনীপুর।

নবম : শ্রাবনী সেনাপতি, আমলাগোড়া, মেদিনীপুর।

দশম : অনিরুদ্ধ গুহরায়
কাশীনাথ দত্ত রোড, বরাহনগর।

(৮ পাতার শেষাংশ)

ডালমেশিয়ান এ্যালসেশিয়ান।
সাবধান ওহে খুব সাবধান ॥
এ্যালসেশিয়ান ডালমেশিয়ান।
মঞ্চে নাটক প্যান্ডেলে গান ॥
ডালমেশিয়ান এ্যালসেশিয়ান।
দারোগাবাবুকে দ্রুত ডেকে আন ॥
এ্যালসেশিয়ান ডালমেশিয়ান।
যে যার পরাণ নিজেই বাঁচান ॥
ডালমেশিয়ান এ্যালসেশিয়ান।
পুরনো পুকুর নতুন দালান ॥
এ্যালসেশিয়ান ডালমেশিয়ান।
মোগল মারাঠা শিখ ও পাঠান ॥
ডালমেশিয়ান এ্যালসেশিয়ান।
ধন্য ধন্য কুকুর পুরাণ ॥

ময়দানবের দ্বীপ

ঝড়ের অন্ধকারে একটা জাহাজের সঙ্গে প্রচণ্ড ধাক্কায় লঞ্চটা চুরমার হয়ে যায়। বিজয় অমিত দুজনে ছিটকে পড়ে।

অমিত! অমিত! কোন সাড়া নেই!

হ্যাঁ হাতে মোটা সাপের মত কি যেন বেকল!

সাপ! একটা প্রকাণ্ড সাপ!

কিন্তু সাপটা অমন এক জায়গায় ভাসছে কি করে?

ওটা কি সাপ না?

না, ওটা একটা কাছি।
৩

কাহিনী · প্রেমেন্দ্র মিত্র ছবি · দিলীপ দাস

নতুন খবর!

বলতে পার সেটা কী? হয়ত ভেবে কূল পাচ্ছ না। তাহলে শোনই বলি।

মাসিক ছড়া প্রতিযোগিতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শুরু হচ্ছে মাসিক গল্প প্রতিযোগিতা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের মাস শ্রাবণ—এই শ্রাবণ থেকেই আমাদের এই প্রতিযোগিতা শুরু করার ইচ্ছে।

মাসিক ছড়া প্রতিযোগিতা যেমন নামে হয় গল্প প্রতিযোগিতাও তেমন নামে হবে। গল্প প্রতিযোগিতার আসরে তোমরা যারা ছবি ছাপতে চাও, এক কপি পাশপোর্ট সাইজের ফটো সহ ২৫ টাকা এখনি দপ্তরে পাঠিয়ে দাও। চিঠিতে বা ছবির পিছনে **গল্প প্রতিযোগিতার জন্য** কথাটি লিখতে ভুলো না। যারা আগে পাঠাবে, তারাই অগ্রাধিকার পাবে।

গল্প পাঠানোর নিয়মাবলী আগামী সংখ্যায় ঘোষণা করা হবে।

মাসিক ছড়া প্রতিযোগিতা !!

গৌরচন্দ্র দাস, বাঁশবাড়ী হাই রোড, মালদা পক্ষিরাজ আহূত মাসিক ছড়া প্রতিযোগিতার প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার দিতে ইচ্ছুক। জ্যৈষ্ঠ মাসের ছড়া প্রতিযোগিতার নামকরণ হল—**গৌর সাহিত্য প্রতিযোগিতা।**

প্রথম পুরস্কার ঃ ১০ টাঃ দ্বিতীয় পুরস্কার ঃ ৫ টাঃ

ছড়ার কোনও নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু নেই। যে কোনও বিষয়ের ওপরেই লেখা যেতে পারে। তবে মৌলিক ও ছোট হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

একজন প্রতিযোগী একটি ছড়াই পাঠাতে পারবে। লেখা পাঠাবার সময় খামের ওপর 'গৌর সাহিত্য প্রতিযোগিতা' কথাটি উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন। প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত ছড়া দুটি রচয়িতার নাম সহ পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে এবং পুরস্কারের টাকা M. O. যোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ছড়া পাঠাবার শেষ তারিখ ৩০ জুন '৮১।

বিঃ দ্রঃ পক্ষিরাজের পাঠক/পাঠিকাদের মধ্যে যে কেউ এই নব পরিকল্পনায় অংশ নিতে পারেন। অর্থাৎ কেউ ১৫'০০ টাকা (**প্রথম পুরস্কার ১০ টাকা ও দ্বিতীয় পুরস্কার ৫ টাকা**) সহ এক কপি পাশপোর্ট সাইজের ফটো (অবশ্যই গ্লসিতে ছাপা) পত্রিকা অফিসে পাঠালে, অনুরূপভাবেই আমরা পরবর্তী কোনও মাসে সেই ছবি প্রকাশ করব এবং সেই নামে সাহিত্য প্রতিযোগিতা আহ্বান করব।

এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবার পর যারা আগে ছবিসহ টাকা পাঠাবেন, তারাই এতে অগ্রাধিকার পাবেন।

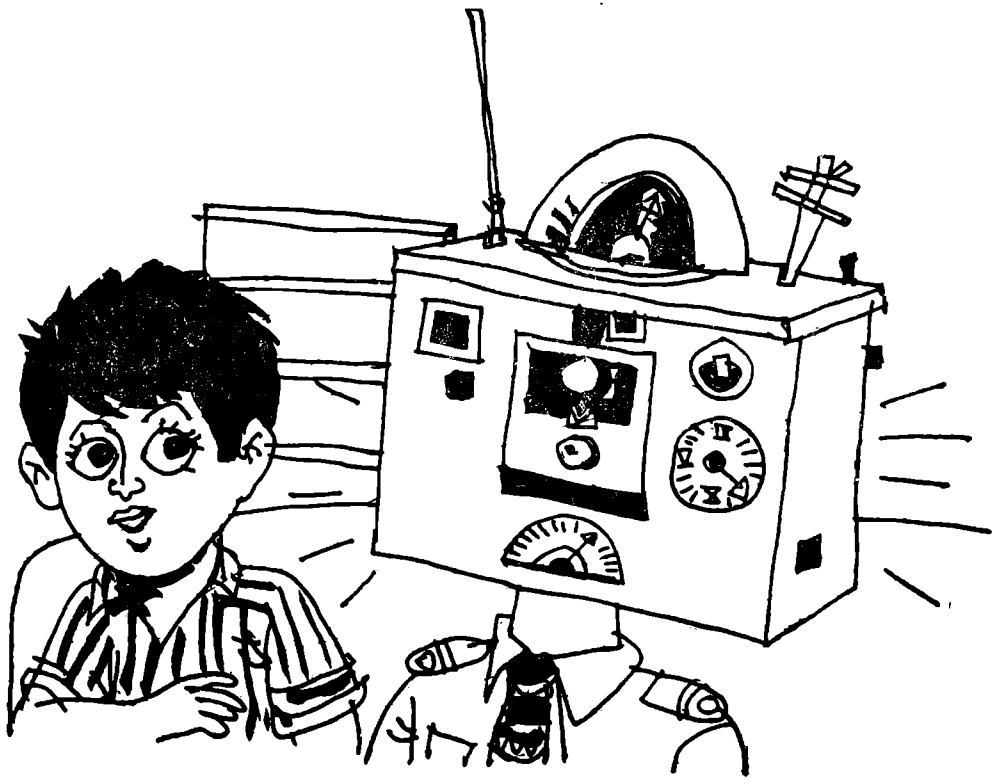

ঝিলিক বাসের জন্য দাঁড়িয়েছিলো।

তার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে মার তৈরি করা মিষ্টি রয়েছে। মাসীকে পেঁছিয়ে দিয়ে আসতে হবে। ঠিক হয়েছিলো বাবা অফিস যাবার পথে তাকে নামিয়ে দিয়ে যাবেন কিন্তু হটাৎ তাঁর অফিসের গাড়ী হাজির। বড়ো সাহেব ডেকে পাঠিয়েছেন।

সুতরাং ঝিলিককে একলাই যেতে হচ্ছে।

ঠিক ঠিক চিনে যেতে পারবি ত'? মা জিজ্ঞেস করেন।

তুমি কি আমায় কচি খোকা মনে করো? জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে ঝিলিক জবাব দেয়। বিরক্ত হয়। মা তাকে ভাবেন টা কি? রোজ একলা স্কুল যেতে পারে—আর মাসীর বাড়ী যেতে পথ হারাবে। তার বারো বছর বয়স, সে ক্লাশ সিক্সে পড়ে!

মনে রাখবি—বাসটা ব্রীজ ছাড়বার পর কালী মন্দিরের সামনে নেমে ডানদিকের গলি দিয়ে গিয়ে বাঁ হাতের চার নম্বর বাড়ীর দোতলায়। মা আবার মনে করিয়ে দিলেন।

জানি! ঝিলিক গম্ভীর।

জায়গাটার নাম বাতাসাতলা, না মা? তার ছোটো বোন জিজ্ঞেস করলো।

হ্যাঁ। তিনি জবাব দিলেন।

আর বাড়ীর একতলায় লবেন চুষের দোকান আছে, না?

হ্যাঁ। মা বললেন, ওদের ফোনের লাইন খারাপ, নয়ত জানিয়ে দিতাম তুই যাচ্ছিস। ওরা কাউকে বাস স্টপে পাঠিয়ে দিতো।

গোল গোল গণ্ডগোল

কালীকিংকর কর্মকার

কাউকে মানে হাঁদু-দাকে!

ঝিলিকের চেয়ে বছর খানেকের বড়ো। তবে দেখে মনে হয় আরও বেশী বয়সের। সেই সুবাদে তাকে 'দাদা' বলা!

ভারী ত' এক বছরের বড়ো। সে যদি রাজ্য জয় করতে পারে ত' ঝিলিক কম যায় কিসে?

বাসটা ফাঁকাই ছিলো। দোতলা বাস।

সে উঠে পড়ে লেডিজ সীটের হাতল ধরে টাল সামলে পকেট থেকে খুচরো পয়সা বের করে কণ্ডাকটারের হাতে দিলো এবং বলল, বাতাসাতলা যাব।

লেডিজ সীটে একটি কলেজের মেয়ে বসেছিলো। অনেকটা তার টিউনি পিসীর মতো দেখতে। মিষ্টি হেসে সে তাকে পাশে বসবার অনুমতিও দিলো। কিন্তু লেডিজ সীটে বসাও বিপদ। অন্য কেউ উঠলেই জায়গা ছেড়ে দিয়ে দাঁড়াতে হবে কিংবা তাদের কারুর কোলে বসতে হবে। আর কিছু পরেই শুরু হ'বে তাদের প্রশ্ন ঃ খোকা, তোমার নাম কি? কোন স্কুলে পড়ো? কোন ক্লাশে? কোথায় যাচ্ছো? ইত্যাদি ইত্যাদি!

সব সে বরদাস্ত করতে পারে—অসহ্য লাগে তাদের ঐ 'খোকা' সম্বোধন। তাছাড়া সেন্ট পাউডারের উগ্র গন্ধের সঙ্গে ডিজেল পোড়া গন্ধ আরও বিশ্রী!

টিকিট নিয়ে সে সামনের দিকে এগিয়ে গেলো।

জানলার পাশের সীটটা ফাঁকা।

রোদ এসে পড়েছে আর সীটের গদি ছেঁড়া বলে কেউ সেটা এখনও দখল করেনি।

কোলের ওপর ব্যাগ নিয়ে ঝিলিক বসলো—বসে জানলা দিয়ে সে বাইরের চলমান দৃশ্য দেখতে লাগলো। মানুষ-জন, গাড়ী ঘোড়া, ঘর বাড়ী। মুহুর্মুহু দৃশ্য বদলাচ্ছে, নতুন নতুন লোক মঞ্চে নামছে!

হঠাৎ লাল বাতির ধাক্কায় বাসটা বাধা পেয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে লাগলো।

ঠিক তখনই গাড়ীটাকে সে দেখলো—বাসের একদম পাশ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে। সবুজ রঙের গাড়ী। চকচক করছে। আলো ঠিকরে পড়ছে। নির্ঘাৎ বিদেশী গাড়ী। জাপানী অথবা ইটালিয়ান হ'বে হয়ত—ওদের দেশের গাড়ী দেখতে সত্যিই সুন্দর। চোখ জুড়িয়ে যায়। চালিয়েও নাকি আরাম!

কিন্তু যা তাকে অবাক করলো তা হ'লো গাড়ীর ড্রাইভার আর তার পেছনে বসা আরোহী—দুজনের কারুরই মাথা নেই।

মাথার পরিবর্তে চৌকো বাক্স ধরণের কিছু বসানো যার ওপর এয়ারপোর্টে দেখা রেডার অ্যানটেনা মন্থর গতিতে ঘুরছে। ড্যাশবোর্ডের দিকে তাকাতে ঝিলিক আরও বিস্মিত হ'লো। মোটেই সাধারণ গাড়ীর মতো দেখতে নয়। স্টীয়ারিং হুইল নেই, গীয়ার লীভার নেই। রয়েছে কেবল সারি সারি বোতাম আর একটা টি. ভি. পর্দার মতো স্ক্রীন।

গাড়ীখানি বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে বেরিয়ে যাবার পর বহুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। কোন দেশের গাড়ী জানবার বড়ো ইচ্ছে হ'লো—কিন্তু তাতে কোনো লাইসেন্স প্লেট ছিলো না। যা সত্যিই আশ্চর্যের—ঝিলিক জানে যে কোনো গাড়ীর রেজিস্ট্রেশন নম্বর থাকতে বাধ্য। না থাকাটা যে আইনী।

তার পাশের যাত্রীটি ইতিমধ্যে কখন যেন নেমে গেছলেন।

ঝিলিক পা ছড়িয়ে একটু আরাম করে বসতে গিয়ে বাধা পেলো·····

আরেকটি লোক প্রায় নিঃশব্দে জায়গাটি দখল করলেন। তাঁর দিকে তাকাতেই ঝিলিকের বুকের রক্ত হিম হয়ে গেলো। একটু আগে গাড়ীতে দেখা অবিকল সেই ড্রাইভার আর তার আরোহীর মতো তাঁর মাথাটাও চৌকো বাক্সের মতো—ওপরে মন্থর গতিতে অ্যানটেনা ঘুরছে!

ঝিলিক নড়ে চড়ে বসলো।

এঁরা কারা? মানুষ ত' নয়। তবে কি রোবো? নাকি অন্য গ্রহের জীব?

"ঝিল্লিবাবু!" লোকটি যেন তার মনের কথা টের পেলেন, ভয় পেও না। আমরা তোমার কোন ক্ষতি করবো না!

আ—আপনাকে ত' চি—চিনতে পারলাম না!

ঝিলিকের গলা কেঁপে উঠলো।

অথচ আমি তোমায় চিনি। কি মজার, না? তিনি পকেট থেকে ট্রানজিসটার রেডিও'র মতো একটা যন্ত্র বের করে কয়েকটা সুইচ নাড়াচাড়া করে কি সব যেন করলেন—ঝিলিক তন্ময় হয়ে তাঁর রকম সকম দেখলো।

ওটা কি? সে জিজ্ঞেস করলো।

ডাইরেকশন ফাইণ্ডার! তিনি হাসলেন। আমি যে এখানে পৌঁছেছি সেটা কন্ট্রোল রুমে জানিয়ে দিলাম। পুরো পৃথিবী এখন আমাদের দখলে।

না—মানে? আপনারা কোত্থেকে আসছেন? কেন আসছেন?

আমরা চাঁদের দেশে বাস করি!—তিনি জানালেন।

কিন্তু সেটা ত বাসের উপযোগী নয়! ঝিলিক প্রতিবাদ করলো।

কে বলেছে? আমরা সেখানে কদিন যাবৎ আছি জানো?

তবে আমেরিকা থেকে দেখে এসে যে বললেন—

তাঁরা ভুল কিছুই বলেননি। ভদ্রলোক ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করলেন, কারণ তাঁদের আসবার খবর পেয়েই আমরা অন্য গ্রহে গিয়ে গা ঢাকা দিই!

কেন? তাঁরা যদি আপনাদের দেখা পেতো ত' কি ক্ষতিটা হ'তো?

সাথে সাথে তোমরা সেটা দখল করতে। তোমরা ভীষণ স্বার্থপর। ভালো জিনিস একদম দেখতে পাওনা। সেখানে বসতি গড়ে তোমরা নির্ঘাৎ তোমাদের পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করতে—আমাদের শান্তির বারোটা বাজাতে!

পৃথিবীর লোক সংখ্যা দিনকে দিন বাড়ছে বলে আমাদের অন্য গ্রহে যাবার কথা বাধ্য হয়ে ভাবতে হচ্ছে! ঝিলিক স্বপক্ষে যুক্তি দেখালো। পৃথিবীবাসীর বদনাম মানে তার নিজেরও বদনাম।

কেন? ভদ্রলোক বিরক্ত হ'লেন, তোমাদের গ্রহের চারভাগের তিনভাগ জল—সেই জলের নীচে বাস করার চেষ্টা কেন করছো না? তোমাদের বিজ্ঞান ত' সাংঘাতিক উন্নত বলে গর্ব করো—পারোনা সেরকম বাড়ী বানাতে যা জলের চাপে ধ্বংস হ'বে না? কিংবা মরুভূমিতে? সেখানেও ত' কলোনী গড়তে পারো। অ্যাটম বোমা বানাচ্ছো। উপগ্রহ পাঠাচ্ছো আর মরুভূমিকে বাগে আনতে পারছোনা?

ঝিলিকের মুখে এই সব প্রশ্নের সদুত্তর জোগালো না।

আসল কথা কি জানো?—তোমরা কষ্ট করতে চাও না। তোমরা তৈরি খাবার খেতে ভালোবাসো।

ঝিলিক এবার রীতিমতো লজ্জিত—পৃথিবীবাসীকে অন্যেরা তাহলে এতো হীন বলে মনে করে। সে কি একটা বলতে যাচ্ছিলো—হঠাৎ ভদ্রলোকের হাতে ধরা সেই যন্ত্র থেকে কিরকম একটা 'ব্লিপ-ব্লিপ' আওয়াজ এলো। যেন কোনো কিছুর সংকেত। যান্ত্রিক শব্দ শুনতে শুনতে তিনি হাসলেন।

বুঝলে ঝিলিক। তিনি সস্নেহে বললেন, সমস্ত বড়ো বড়ো শহর আমাদের কব্জায় এসে গেছে - কেবল তোমাদের এই কলকাতায় বেগ পেতে হচ্ছে।

মানে? ঝিলিক কৌতূহল প্রকাশ করলো।

যে কোনো শহরের আসল সংযোগের মাধ্যম হলো রেডিও স্টেশন! তিনদিন ধরে সেটাতে ঢোকার চেষ্টা করছি—কিন্তু সম্ভব হচ্ছে না। চারিদিকে রাতদিন হাজার হাজার লোক হৈচৈ করছে। সমানে আসছে, যাচ্ছে। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, মারপিট করছে। কি একটা খেলা হচ্ছে নাকি!

বুঝেছি! ঝিলিক হাসলো, ওটা বোধহয় ক্রিকেট!

হবে হয়ত। যখন খেলা চলে তখন সব শান্ত। খেলা থামলেই চেঁচামেচি!

হ্যাঁ, হ্যাঁ—ঐ ত'—ওটাকেই ক্রিকেট বলে!

আর অন্য খেলাটা? যাতে সব সময় চীৎকার লেগে থাকে?

সম্ভবতঃ ফুটবল। একটা বল নিয়ে খেলে ত'?

ঠিক! ঠিক! আচ্ছা, একটা বল নিয়ে কাড়াকাড়ি না করে সবাইকে একটা করে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়। এই সাধারণ অতি সহজ আইডিয়াগুলো কেন তোমাদের মাথায় আসেনা বুঝে পাইনা—আচ্ছা 'তোমরা গোল দারুণ পছন্দ করো, না?

আপনার এ প্রশ্নের হেতু? ঝিলিক অবাক।

তোমাদের সব খাবার দেখি গোল। যেমন ধরো রসগোল্লা, লুচি, বাঁধাকফি, আলু, টমাটো, লেবু—এমনকি ফুচকা! তোমরা লোককে পা-গোল বলো, জন্তুকে ছা-গোল। জং-গোলে তোমরা লাং-গোল চালিয়ে তাল-গোল পাকাও! স্কুলে তোমরা ভূ-গোল পড়ো। সব সময় গণ্ড-গোল করো, খেলার সময় 'গোল-গোল' করে চেঁচাও!

পৃথিবীটা গোল বলেই বোধহয়। সে এই ভিনগ্রহবাসীকে বোঝালো।

হবে হয়ত! বিড়বিড় করে তিনি আপন মনে বললেন।

হঠাৎ কে যেন ঝিলিকের কাঁধ ধরে ঝাঁকালো—

কৈ খোকা—বাতাসাতলা এসে গেছে। নামবে না?

ঘাড় ফিরিয়ে ঝিলিক দেখলো: কন্ডাকটার দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সে ধড়মড় করে উঠে বসলো। সে তাহলে আবার জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছিলো। বাস থেকে নামতে নামতে চোখে পড়লো কালীমন্দির। তার পাশের গলির বাঁ হাতের চার নম্বর বাড়ীর দোতলায় মাসী থাকেন।

তাঁর জন্য যে মিষ্টি নিয়ে আসছে। মিষ্টিগুলো গোলাকার।

চুনো পুঁটি
ঐ পুঁটি আসছে। এই ক্যামেরাটা দিয়ে আজ একটা মজা করবো। হিঃ-হিঃ-হিঃ-
আয় পুঁটি। তোর যদি ফটো তোলার ইচ্ছে থাকে তবে চটপট দাঁড়িয়ে যা।
আরিব্বাস, ক্যামেরা!
রেডি,-ওয়ান-টু-
স্কুর-র-র-র
হাঃ-হাঃ-হাঃ
গর-র-র!
কিছুক্ষণ পরে
বাঁদরটা এখন নেই, এই ফাঁকে এটা একটু এদিক-ওদিক করে রাখি। ওকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে!
চুনো, এই ভোঁদড় একটা ফটো তুলতে চাইছে।
ভেরি গুড়! চুপচাপ দাঁড়িয়ে যাও, তুলে দিচ্ছি-
ওয়ান-টু-থ্রি-
ফ্যাচাস
?!

ভূতের উপর মামদোবাজী

বিনয়ভূষণ ভৌমিক

আমাদের গাঁয়ের নবীন সেদিন বেশ রাত করে পাশের গাঁয়ের হাট থেকে ফিরছিল। 'ছাতনার বাগের' পাশের নির্জন দু'পেয়ে রাস্তাটা দিয়ে। হাতে ঝোলানো বেশ বড়সড় একটা গঙ্গার ইলিশ। বর্ষাকাল, আকাশ মেঘে ঢাকা। টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে সারাদিন ধরে, আবার কখনও বা মুষল ধারে। ঝাকড়া মাথা কালোজাম গাছটার নীচে আসতেই হঠাৎ তার ঠিক তিন গজ দূরে দেখতে পেলো প্রকান্ড একটা মিশমিশে কালো লোক রাস্তাটার দুইদিকে দুই ঠ্যাং ছড়িয়ে সবটা রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে। অন্ধকারে ভাল দেখতে পায়নি বলে নবীন লোকটার খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। এখন আর পালাবারও কোন উপায় নেই। পেছনে ফিরলেই লোকটা লম্বা হাত বাড়িয়ে খপ করে তার ঘাড় ধরে ফেলতে পারে। লোকটা খোনা গলায় নবীনকে বললো -'তোর হাতের মাছটা আমাকে দে'।'

এই রকম একটা পরিস্থিতিতে নবীন প্রথমটা একটু হকচকিয়ে গেলো। কিন্তু সে ছিল খুব সাহসী আর গায়েও অসাধারণ শক্তি তাই ভয় না পেয়ে সেও সমান তালে উত্তর দিলো—"আমি হাটে বেগুন বিক্রি করে মাছটা কিনে এনেছি তোকে দিয়ে দেওয়ার জন্য? কে তুই? এরকম করে আমার পথ আগলে রেখেছিস কেন? পথ ছাড় বাড়ী যাই। বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে তোর সঙ্গে মস্করা করতে ভাল লাগছে না।' লোকটা তখন তাকে তার দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে যাওয়ার জন্য বার বার বলতে লাগলো কিন্তু তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে নবীন কিছুতেই রাজী হলো না। সেও ছাড়বে না নবীনও যাবে না এভাবে দু'জনের মধ্যে বাদানুবাদ চলতে চলতেই পেছনে আর একদল হাটুরে লোকের গলার আওয়াজ পাওয়া গেলো। নিজেদের মধ্যে তারা কথা বলতে বলতে আসছে। মুহূর্তের জন্য ঘাড় ঘুরিয়ে নবীন যেই মাত্র পেছনের লোকজনদের দেখতে গেছে অমনি লোকটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো। এতক্ষণ দৈত্যের মত ভয়ংকর চেহারার একটা লোক মাত্র তার তিন গজ সামনে দাঁড়িয়েছিল আর এখন তার কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই! চোখের পলকে পালালো কোনদিক দিয়ে! নাকি হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে গেছে জলজ্যান্ত একটা ভীমদর্শন মানুষ! হতভম্ব নবীন দাঁড়িয়ে ভাবছে একি ভৌতিক না তার চোখের ভুল! আজকাল রাতে তাহলে কি সে ভুল দেখতে শুরু করেছে। বেশ ভাল করে চোখ রগড়ে অন্ধকারে যতটুকু দেখা যায় তন্নতন্ন করে দেখলো—না কোন চিহ্নই নেই। ততক্ষণে লণ্ঠন হাতে ঝাঁকা মাথায় চারজন লোক তার কাছাকাছি চলে এসেছে। তারাও অন্ধকারে নবীনকে এভাবে একা একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হলো। নবীন তাদের এসব কথা কিছুই বললো না, যদি তারা বিশ্বাস না করে। বরং বললো—"অন্ধকারে একা একা যাচ্ছিলাম, তোমরা পেছনে আলো নিয়ে অনেক লোক আসছ দেখে সঙ্গে যাব বলে অপেক্ষা করছিলাম।" অবিনাশ বললো—"কাজটা ভালো করোনি, এ জায়গাটার মোটেই সুনাম নেই। একটু অপেক্ষা করে আমাদের সঙ্গে এলেই পারতে" ছাতা মেরামত করার মিস্ত্রী ছেলামত চাচা বললো—"ভয়টয় পেয়েছ নাকি গো নবু? আগেও শুনেছি এখানে নাকি অনেকেই ভয় পেয়েছে।" নবু বলে

না চাচা সে সব কিছু না, এমনি তোমাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে বাকি পথটা যাওয়া যাবে ভেবে অপেক্ষা করছিলাম।" আসল কথা কিন্তু সে কাউকেই বলতে চায় না। সাহসী আর শক্তিশালী লোক বলে গাঁয়ের সবলোক তাকে জানে। সে ভয় পেয়েছে জানলে সেটা তার পক্ষে খুব লজ্জার কারণ হবে।

বাড়ী গিয়ে নবীন তার বউকেও কিছু বললো না। রান্না হয়ে গেলে বৌ খেতে ডাকলো। কিন্তু অবাক কাণ্ড কড়াতে এক টুকরো মাছও নেই। বৌ যখন তাকে ডাকতে দাওয়ায় গেলো সেই অবসরে একটা কালো বিড়াল সবগুলো মাছ সাবাড় করে ঠোঁট চাটতে চাটতে তাদের সামনে দিয়েই রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো। এরকম বিড়াল-ত-আগে এ পাড়ায় কোন দিন দেখা যায় নি। চোখ দুটো যেন অন্ধকারে আগুনের ভাটার মত জ্বলছে। তখন বাধ্য হয়ে নবীন সবকথা তার বৌকে খুলে বললো। শুনে বৌয়েরত দাঁতে দাঁত লেগে যাওয়ার অবস্থা। সেই রাতেই নবীনের ভীষণ জ্বর। জ্বরের ঘোরে বার বার "ভূত"—"ভূত" বলে চেঁচিয়ে উঠতে লাগলো। আর সবচেয়ে আশ্চর্য এতবড় সাহসী জোয়ান লোকটা একদিনের জ্বরে মরে গেলো।

কথাটা মুখে মুখে আরও ডালপালা বিস্তার করে চার পাশের দশ বিশটা গাঁয়ে প্রচার হয়ে গেলো। ভয়ে সন্ধ্যের পর আর কোন লোক ঘর থেকে বেরোয় না। আর সত্যি সত্যি সেই থেকে আমাদের বলরামপুর গ্রামে ভীষণ ভূতের উপদ্রব শুরু হলো। কোথাও কিছু নেই যেখানে সেখানে ধুপ ধাপ করে বৃষ্টির মত ঢিল পড়তো। অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে হতে শেষটায় এমন দাঁড়ালো গাঁয়ের লোক সন্ধ্যার পর আর কেউ ঘরের বাইরে যায় না। সন্ধ্যা হতে না হতেই যে যার দরজায় খিল তুলে দিতো। রাত নয় যেন একটা দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা। সারা দিন ক্ষেত খামারে কাজ করে সন্ধ্যের পর গাঁয়ের সরল সইজ মানুষগুলো কীর্ত্তণ—গানে মেতে উঠতো। খোল করতালের তালে নেমে আসতো একটা আনন্দের পরিবেশ আর আজ সেখানে বিরাজ করছে একটা ভুতুড়ে আবহাওয়া। কোথাও কোন আলো জ্বলছে না। নেই কোন মানুষের সাড়াশব্দ। এমন কি দুধের বাচ্চারাও যেন একটা অজানা আতঙ্কে কান্না ভুলে গেছে। গ্রাম নয় যেন একটা মৃত পাষাণ পুরী। রূপকথার সেই যাদুদণ্ডের ছোঁয়ায় সব যেন পাষাণে পরিণত আবার ভোরের রবির সোনার কাঠির ছোঁয়ায় জেগে উঠবে একে একে। জাগবে মানুষ। জাগবে গাছে গাছে পাখিরা। রাতে মাঝে মাঝে শিয়াল কুকুরের চিৎকার ছাড়া কোথাও কোন প্রাণের সাড়া পর্যন্ত নেই। কুকুরগুলোও যেন ভয় পেয়ে জোরে জোরে চিৎকার করতে থাকে। অস্বাভাবিক কিছু একটা দেখতে পায় এমনি আতঙ্কগ্রস্থ তাদের প্রাণপণ চিৎকার।

এমনি দিনে বলরামপুরে এলো অদ্ভুত একজন মানুষ। কালোর উপর সাদা কাপড়ের টুকরোর অসংখ্য তাপ্পি দেওয়া নোংরা একটা আলখাল্লা। হাটুর নীচ অব্দি যার ঝুল আর দুর্গন্ধের জন্য কুকুরগুলো তেড়ে এলো পেছন পেছন ঘেউ ঘেউ করতে করতে। লম্বা কাঁচা পাকা চুল দাড়ি। গলায় বড় বড় কাচের পুঁতি আর নানা রঙ বেরঙের পাথরের মালা। কাঁধে মস্ত একটা ঝোলা। ডান-বগলে মোষের শিংয়ের একটা শিঙ্গা আর হাতে প্রকান্ড একটা লোহার চিমটা। বেশ জোরে জোরে শিঙ্গাটা কবার ফুকতেই কুকুরগুলো বেপাত্তা আর তার বদলে চারপাশে মানুষের ভীড় জমে উঠলো। দেখতে দেখতে ভীড়টা বেশ ভারীই হলো। মেয়ে, পুরুষ, ছেলে, বুড়ো কৌতুহলী লোকেরত আর অভাব নেই। সবাই জানতে চায় লোকটা কে? কোথা থেকে এলো, আর তার উদ্দেশ্যই বা কি?

সেও ত তাই চায়। মওকা বুঝে সগর্বে ঘোষণা করলো—"আমার নাম কদম ফকির। শুনলাম এ গাঁয়ে নাকি ভূতের উপদ্রব হয়েছে। তবে আমি যখন খোদার রহমতে একবার এসে পড়েছি তখন আর তোদের কোন ভয় নেই। উস্তাদের দোয়ায় কত তাঁদোড় ভূত আমি দেশ ছাড়া করেছি আর এতো সামান্য একটা মেছো ভূত। এটাকে সাত দিনের মধ্যে যদি না দেশছাড়া করতে পারি তাহলে আমার নামে তোরা কুকুর পুষিস।"

শুনে ভীত সন্ত্রস্থ গাঁয়ের মানুষগুলো যেন হাতে স্বর্গ পেলো। ফকিরের কি আদর যত্ন। তার থাকা খাওয়ার যেন কোনরকম ত্রুটি না থাকে তার যোগাড় যন্ত্র করতে কাড়াকাড়ি পড়ে গেলো।

এতদিনে ভগবান তাদের উপর মুখ তুলে চেয়েছেন। না হলে এতবড় একজন সিদ্ধলোক নিজে থেকে তাদের এই দুঃসময়ে রক্ষা করতে এসেছেন? নিশ্চয় তিনি ভগবান প্রেরিত। তাদের এতদিনের কাতর আবেদনে সাড়া দিয়ে ভগবানই তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সকলের সব সেরা জিনিসটা কদম ফকিরের সেবার জন্য নিবেদন করলো।

ফকির গুড় পড়ে খেতে দিলো সবাইকে আর দিলো ধুলো পড়ে বাড়ীর চারদিকে ছিটিয়ে। যাতে গন্ডির ভিতর অন্তত কিছু প্রবেশ করতে না পারে। আর যা করণীয় তা তিনি নিজেই করবেন। কিন্তু একটা ব্যাপারে

সবাইকে সাবধান করে দিলেন—কেউ যেন কৌতূহলি হয়ে দরজা খুলে রাত্রে ঘরের বাইরে না বেরোয় বা উঁকি ঝুঁকি না দেয়। এ বড় মারাত্মক খেলা। জীবন হাতের মুঠোয় নিয়ে তবেই অশরীরীদের মোকাবেলা করতে হয়। সহজে কি এরা ছেড়ে যেতে চায়। একটু অন্যমনস্ক বা সামান্য ভুল ত্রুটি হলে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশোধ নিয়ে নেবে একেবারে ঘাড় মটকে দিয়ে। অতএব কেউ যদি কথার অন্যথা করে আর কোন কিছু দেখতে পায় এবং তার জন্য তার যদি কোন অনিষ্ট হয় তাহলে সব দায় দায়িত্ব তার নিজের। তখন যেন ফকির সাহেবকে কেউ দোষারোপ না করে। আরও একটা কথা সকলকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ফকির যখন মন্ত্রবলে গভীর রাতে ভূতের মোকাবেলা করবেন তখন তার শরীরে কোন কাপড় চোপড় থাকবে না। এই অবস্থায় যদি কেউ তাঁকে দেখে তাহলে চিরদিনের মত সে অন্ধ হয়ে যাবে।

এত কথার পর স্বভাব ভীতু সরল বিশ্বাসী গ্রামবাসী কে আর নিজের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে যাবে? সহজ সরল গাঁয়ের লোকেরা ফকিরের উপর নিরাপত্তার দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে দরজায় খিল দিতো আর ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ পরম সুখে তাঁর কাজ কারবার চালিয়ে যেতো। কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকার কি উপায় আছে? এদিকে ভূতের ভয়ে সবাই যখন আধমরা ঠিক তখনি সুযোগ বুঝে শুরু হয়েছে চোরের উপদ্রব। চোরদের যেন ভূতের ভয়টয় নেই। অবস্থার সুযোগ নিয়ে প্রায় প্রতি রাতেই চুরি হতে থাকলো। গরীব মানুষদের যৎসামান্য মূল্যবান জিনিসপত্র কাপড় চোপড় মায় গরু বাছুর পর্যন্ত নিশি কুটুম্বরা নিয়ে কেটে পড়তে লাগলো। নিজেরা এর কোন প্রতিকারের রাস্তাই খুঁজে পেলো না। ফকিরের নির্দেশে রাতে তাদের ঘরের বাইরে যাওয়া বারণ, আর দশ মাইল দূরের থানায় নালিশ জানিয়েও কোন লাভ হবে না। হয়ত বাবুদের খুশীমত একদিন একজন এসে একটু ঘুরে টুরে যাবেন আর বলবেন সন্দেহজনক লোকের নাম বল। তাতে কাজের কাজ কিছু হবে না বরং মাঝখান থেকে শত্রুতা বাড়বে।

তারা মনে মনে ভাবে চোর বেটাদের সঙ্গে ফকির সাহেবের যেদিন দেখা হয়ে যাবে সেদিন হবে আসল মজা। শুধু সেই দিনটির জন্যই তারা সকলে অপেক্ষা করে বসে আছে।

একদিকে ভূতের উপদ্রব আর একদিকে চোরের উপদ্রব এমনি এক দুর্দিনে নবদ্বীপ হাজরার ভাগ্নে শশাঙ্ক এলো। সঙ্গে তার শহুরে বন্ধু আদিত্য। তেইশ চব্বিশ বছরের তরুণ দেখতে যেন রাজপুত্র। শশাঙ্ক এ গাঁয়ে অপরিচিত নয়। ছেলেবেলায় মামাবাড়ী অনেক এসেছে। বড় হয়ে এখন শহরে থাকে। অনেকগুলি পাশটাসও করেছে। শোনা যায় স্বদেশী করে বলে তাকে নাকি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়। মাঝে মাঝে এখানে তিন চারদিন থাকে আবার হুট্ করে কোথায় উধাও। পুলিশ তার খোঁজে কয়েকবারই গাঁয়ে এসেছে। সব শুনেটুনে দুই বন্ধুতে ইংরেজীতে কি সব কথা বার্তা হলো তার একবর্ণও কেউ বুঝতে পারলো না।

গভীর নিশুতি রাত, ঘুটঘুটি অন্ধকার। কোথাও কোন জন মানবের সাড়াশব্দ নেই। বড় বড় ঝাকড়া গাছগুলিকে মনে হয় জমাট বাঁধা অন্ধকার। একটানা ঝিঁঝিঁর ডাক। ঝোপের ভিতর অসংখ্য জোনাকির আলো জ্বলছে আর নিবছে যেন নিশাচর প্রেতেরা টর্চ ফেলে কি খুঁজে বেড়াচ্ছে। ঘরে ঘরে প্রতিটি প্রাণী গভীর নিদ্রায় মগ্ন। হাজার ডাক ডাকিতেও কেউ আর বাইরে বেরোবে না। হঠাৎ একটা পেঁচার কর্কশ চিৎকার ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে সীমাহীন অন্ধকারে মিশে গেলো। আবার সব চুপচাপ। পো-ও-ও, পো-ও-ও, ফকিরের রহস্যময় শিঙ্গার সংকেত শোনা গেলো। সমস্ত গ্রাম যখন ঘুমে অচেতন তখন তিনিই একমাত্র জাগ্রত প্রহরী। স্বেচ্ছায় তিনি গ্রামবাসীদের শুভাশুভের সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। ঝুন্ ঝুন্ ঝুন্ ঝুন্ দূর থেকে জল তরঙ্গ বাজনার মত একটা মিষ্টি আওয়াজ ভেসে আসছে। ফকিরের হাতের লোহার চিমটার মাথায় পরানো পিতলের আংটির শব্দ। ক্রমশ শব্দটা কাছে এগিয়ে আসছে। বাঁকটা ঘুরতেই আবছা অন্ধকারে শব্দের সঙ্গে অস্পষ্ট একটা ছায়ামূর্তিকেও এগিয়ে আসতে দেখা গেলো। ক্রমে মূর্তিটা শিবুদের বাঁশ বাগানটার নীচে আসতেই একটা লম্বা ডালপালা হুড়মুড় করে নুয়ে পড়ে ঠিক ফকিরের এক হাত সামনে আড়াআড়ি ভাবে রাস্তাটা অবরোধ করলো। আর বাঁশটার উপর থেকে একটা বিভৎস মুখ প্রকাণ্ড গোল গোল চোখ পাকিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে তাকে কামড়াতে এলো। আপন মনে চলতে চলতে হঠাৎ সামনে একটা ভুতুড়ে কাণ্ড কারখানা দেখে "ইয়া আল্লা" বলে ফকির উল্টোদিকে চোঁ-চোঁ দৌড়। কিন্তু বেশীদূর যেতে পারলো না। অনুমান দশ বার হাত গিয়েই মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়ে গোঁ গোঁ করতে লাগলো। তার মুখ দিয়ে তখন সমানে গাঁজলা বেরুচ্ছে। ভয় পেয়ে লোকটা শেষ পর্যন্ত অজ্ঞানই হয়ে গেলো তার হাতের চিমটে যে কোথায়

ছিটকে পড়লো তার কোন হদিশ নেই। পরদিন থেকে কেউ আর গাঁয়ের ত্রিসীমানায় ফকির সাহেবের ছায়া দেখতে পেলো না। অনেক খোঁজাখোঁজির পর আসল ঘটনা জানতে পারা গেলো শশাংক আর তার বন্ধু আদিত্যর কাছে। তাহলে তাদের মুখেই শোনা যাক কি ঘটেছিল।

সব শুনে টুনে আমরা বুঝলাম ভূতটুত সব বাজে কথা। সবই হচ্ছে যেটা ফকিরের ধাপ্পাবাজী। আসলে ও একটা দাগী চোর। আপনদের সরলতার সুযোগ নিয়ে ভূতের ভয় দেখিয়ে ঠকিয়েছে আর এই সুযোগে সে তার কাজ হাসিল করতো। দিনেরবেলা ফকির সেজে সব দেখে শুনে ঠিকঠাক করে রাখতো আর রাতে দলবল নিয়ে চুরি করতো। কাজ শেষে মালপত্র নিয়ে অন্যরা কেটে পড়তো আর ও বেটা থেকে যেতো পরদিনের কাজ কারবার ঠিক করার জন্য। সবার বাড়ীতেই ছিল তার অবাধ গতি, কেউ কোন রকম সন্দেহ করতো না। আমরা ঠিক করলাম ভূতের রোজাকে ভূতের ভয় দেখিয়েই তাড়াতে হবে। অবশ্য একটু চেষ্টা করলে হাতে নাতে ধরাও কঠিন ছিল না। কিন্তু তখন থানা পুলিশ, আর শেষেরটায় আমাদের আপত্তির কারণ আছে। তাই বেটাকে জব্দ করতে কৌশলের আশ্রয় নেওয়াই ঠিক করলাম। দিনেরবেলা সকলের অলক্ষ্যে বাঁশের ডগায় একটা শক্ত দড়ি বেঁধে রাখলাম। সময়মত আমি দড়ি ধরে প্রাণপণে টানতেই হুড়মুড় করে আস্ত বাঁশটা রাস্তার উপর নেমে এলো আর আদিত্য একটা সাদা রুমাল দিয়ে মুখটা সম্পূর্ণ ঢেকে তার উপর চশমাটা পরে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ছিল রাস্তাটা বন্ধ হয়ে যেতেই ও লাফিয়ে তার সামনে পড়ে কামড়াতে যাওয়ার ভান করলো। এই দেখে লোকটা এমন ভয় পেলো যে একেবারে অজ্ঞান। এই দেখুন তার চিমটেটা আমরা কুড়িয়ে এনেছি। এই অস্ত্রটা তার হাত থেকে ছিটকে দশ হাত দূরে একটা ঝোপের আড়ালে পড়েছিল। জ্ঞান হয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় এটার কথা সে ভুলেই গেছে। জীবন নিয়ে পালাতে পারলেই যথেষ্ট। ভূতের কাছে এমন ভয় পেয়েছে যে জীবনে সে আর কোনদিন এ গাঁয়ের রাস্তায় পা দেবে না।

বলনাচ

যে কোনও সজীব প্রাণী মানুষের নির্দেশ অনুযায়ী চলতে পারে। কিন্তু নির্জীব প্রাণী নিশ্চই-ই না—

যাদুকর হাসতে হাসতে বললেন, পারে। কেমন করে এই দেখুন।

দর্শকরা নীরব। যাদুকর একটা কাঠের বলের মধ্যে সুতো গলিয়ে আড়াআড়ি ভাবে টেনে ধরতেই, বলটা তর্‌তর্‌ করে নেমে এসে যাদুকরের ডান হাতের তালু স্পর্শ করল।

যাদুকর দর্শকদের দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন। যেমন নামল, বলটা তেমনিই উঠবে—এই দেখুন। 'আপ্‌' বলার সাথে সাথেই বলটা আবার তর্‌তর্‌ করে ওপরে উঠতে লাগল।

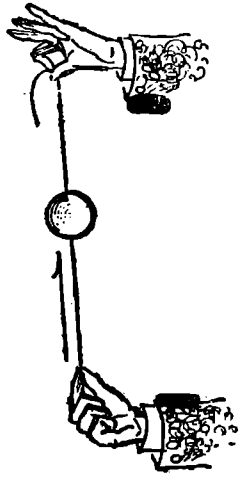

বলটি নীচে নেমে ওই গিঁঠ-এ আটকে থাকে। 'আপ' বলা মাত্রই ডানমুঠোর বাড়তি রবারটুকু ছেড়ে দিলেই বাজীমাৎ। বলটা লাফিয়ে ওপরে ওঠে এবং বাঁহাতে স্পর্শ করে।

দর্শকেরা অলৌকিক ভেবে আনন্দ পাবে।

হাততালিতে মুখরিত হয়ে উঠল যাদুমঞ্চ।

কেমন করে হচ্ছে শোন।

যে সুতোয় বলটা ওঠা নামা করছে ওটা আসলে ইলাস্টিক রবারের। সে রবারের মাঝে একটা গিঁঠ আছে এবং ঐ গিঁঠ সমেত রবারের বাড়তি অংশটুকু ডানহাতের মুঠোর মধ্যে লুকানো থাকে কিন্তু দুই মুঠির মধ্যখানের রবারটা খুব টানের ওপরেই থাকে।

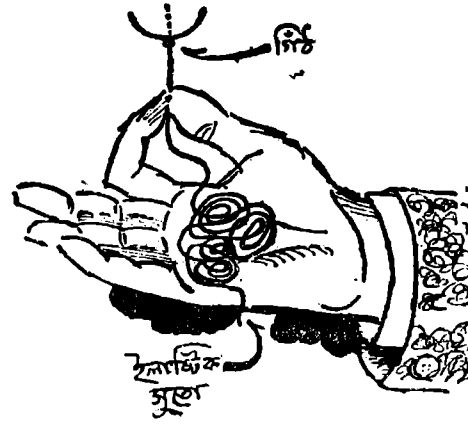

সংবাদ-বিচিত্রা

বিশ্বামিত্র

উত্তর কলকাতার সাংস্কৃতিক সংস্থা 'দর্শমিকা'র উদ্যোগে বেলগাছিয়া পরেশনাথ মন্দিরে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা সম্প্রতি হয়ে গেল। তিনশ'রও বেশি প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার পেয়েছে যথাক্রমে—'ক' বিভাগেঃ রূপা মজুমদার, রাজীব বসু, শুভ্রজিৎ ব্যানার্জী। 'খ' বিভাগেঃ সুদর্শন সাহা, বিশ্বজিৎ দেবনাথ, কুমকুম শীল। 'গ' বিভাগেঃ পম্পা রায়, স্নিগ্ধা রায়, রথীন বোস।

সম্প্রতি নবদ্বীপ বিদ্যার্থী মনিমেলার সমাবর্তন অনুষ্ঠান নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয় ভবনে সুন্দর ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে সুসম্পন্ন হয়। এই অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল মনিভাইবোনদের পরিবেশিত ছড়ার নাচ, লোকনৃত্য এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান অবলম্বনে 'শিশু ভোলানাথ' নৃত্য আলেখ্য।

মালদহ জেলার 'ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্প' প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় ১৯৭৯-৮০ সালের জন্য প্রাথমিক বিভাগ থেকে ১ম পুরস্কার পেয়েছে গোবিন্দপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রী কুমারী মঞ্জু আরা খাতুন।

১৮ মাস বাস্তিল জেলে বন্দী থাকার সময়, ভলটেয়ার লিখেছিলেন হেনরয়েড মহাকাব্য।

বর্মার মান্দালয় জেলে বসে লালা লাজপৎ রায় ভগবদ-গীতার বাণী এবং লোকমান্য গঙ্গাধর তিলক গীতা রহস্য গ্রন্থগুলি রচনা করেন।

জহরলাল নেহেরু 'ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া' লিখেছিলেন কারাগারে বসে।

জেলে বসে জয়প্রকাশ লিখেছিলেন প্রিজন ডায়েরি নামক বহু আলোচিত গ্রন্থটি।

নরওয়ের একটি মৎস্য গবেষণা সংক্রান্ত জাহাজ আরব সাগরে বহু লণ্ঠন মাছের সন্ধান পেয়েছে। আরব সাগরে অন্ততঃ ১০ কোটি টন এই জাতীয় মাছ আছে।

লণ্ঠন মাছ আকৃতিতে খুব ছোট। সমুদ্রের অনেক নীচেই এরা থাকে। এই জাতীয় মাছে প্রচুর প্রোটিন আছে।

দৈনন্দিন জীবন ও বিজ্ঞান

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বিজ্ঞান আজ কত অজানাকে তোমাদের চোখের সামনে মেলে ধরেছে। দেশী বিদেশী পত্রিকা, সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশন মারফৎ কত নতুন নতুন রহস্যের উদ্ঘাটন হচ্ছে তোমাদের জীবনে। নিত্য নূতন।

কিন্তু এই বিজ্ঞানের যুগেও বিজ্ঞানকে আমরা আমাদের জীবনে কতটুকু প্রয়োগ করছি? বিজ্ঞান তো প্রযুক্তি বিদ্যা? ছোট্ট একটা দৃষ্টান্তই ধর না। এই আমাদের শহর কলকাতা। এখানকার ভয়ঙ্কর ভীড়ের কথা তোমাদের কারো অজানা নয়। তার ওপরে যোগ হয়েছে 'পলিউশন'। নানা রকম জ্বালানী কলকাতার বায়ুকে দূষিত করছে অহরহ। এই দূষণের পিছনেও কিন্তু আমাদের অবৈজ্ঞানিক মনোভাবই প্রকাশ পাচ্ছে। কলকারখানার ধোঁয়া ও নোংরা যেমন বায়ু ও জল দূষিত করছে, তেমনি যানবাহনগুলির পরিত্যক্ত পোড়া মবিলের ধোঁয়া এই শহরের বায়ুকে করেছে শ্বাস নেওয়ার অযোগ্য। সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের জ্বালানী উনুনের ধোঁয়া।

তোমরা সকলেই জান ধোঁয়া মানেই কার্বন। যা আমাদের শরীরের পক্ষে বিষবৎ। এবিষয়ে ভাববার দিন এসেছে। তবে ভাবনা চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে গাছ লাগিয়ে 'পলিউশন'-কে রোধ করার আবেদন অনেককাল থেকেই তোমাদের কাছে আমরা জানিয়ে আসছি। কারণ তোমরা জান যে গাছপালা কার্বন ডায়োকসাইড গ্রহণ করে ও অক্সিজেন ত্যাগ করে। এছাড়া গাছের জন্য আবহাওয়া ঠান্ডা থাকে ও বৃষ্টিবাদলও হয়। গাছ মাটির অবক্ষয় দূর করে ও জমির আর্দ্রতা রক্ষা করে।

তোমরা কি ভাবছো এ বিষয়ে

(জনসংযোগ বিভাগ, সি, এম, ডি, এ, ৩-এ, অকল্যান্ড প্লেস, কলকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত।)

পিকলু

পরিচয় গুপ্ত

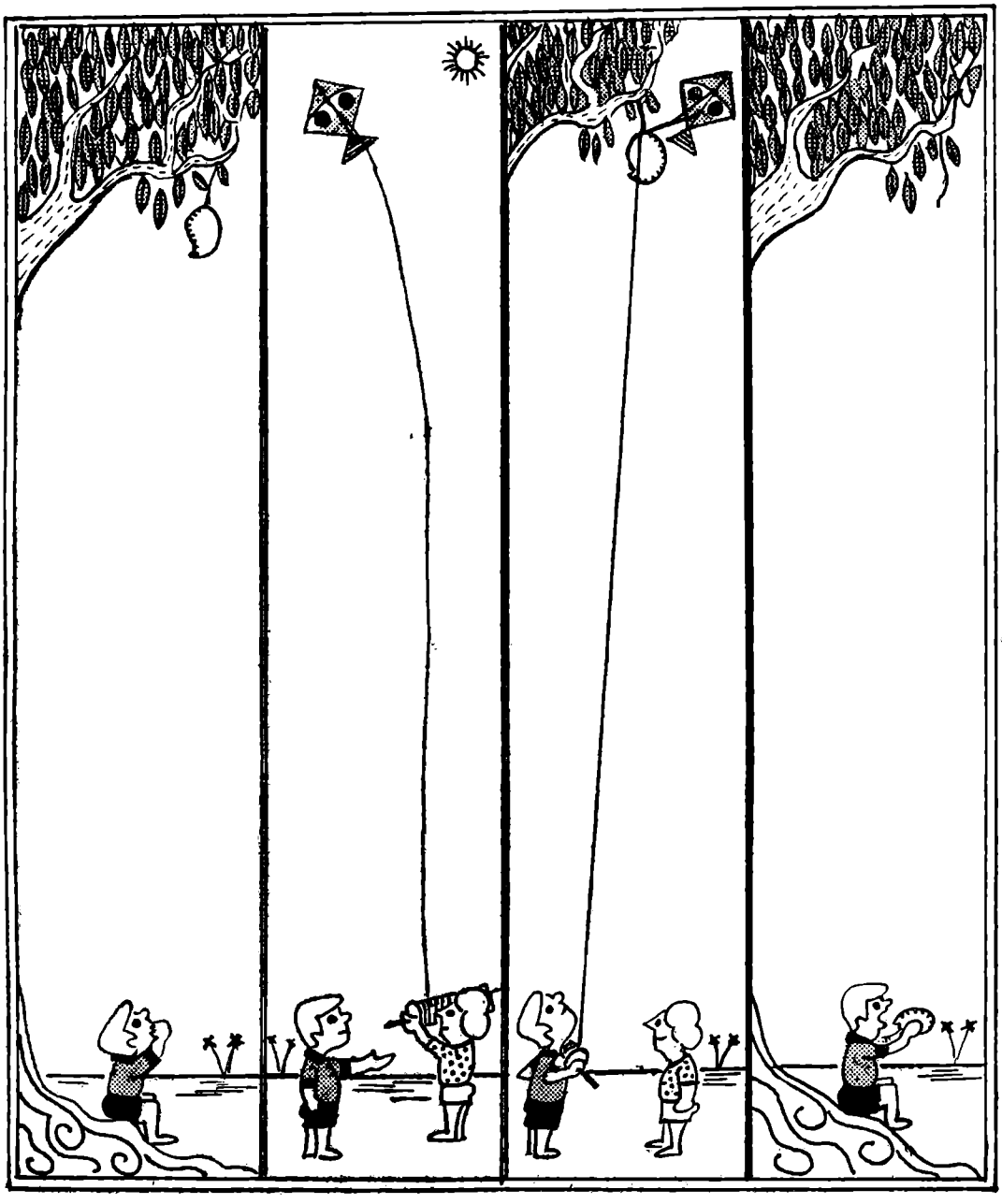

দারুণ ঝগড়া বেধে গেল দুইভাইয়ের। বড় ভাইয়ের বয়স নয়, ছোটর চার। দুভাইয়ের বয়সের ব্যবধান পাঁচ হলে কি হবে ঝগড়া শুরু হলে আর থামতে চায় না। একজন বলবে আউট। অন্যজনের গোঁ-সে আউট হয়নি। বাড়ির পেছন থেকে দুই ভাইয়ের গলা ততক্ষণে মার কানে পেঁছেছে। তিনি জানেন, এক্ষুনি তার ডাক পড়বে।

তখনই কানে এল একজনের গলা। মা মা দেখো, দেখো—দাদা কিছুতেই আউট হবে না। চলো শিগগীর। দেখবে কি হয়েছে। মাকে হয়ত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল ছোট ভাই।

বাড়ির পেছনে, বাগানের পাশটায় ফাঁকা জায়গা। ঐখানে দুই ভাইয়ের টেস্টম্যাচ হচ্ছিল। বড় ভাই অস্ট্রেলিয়া আর ছোটজন ইংলন্ড। রোজই দুভাইয়ের টেস্ট খেলা হয়। রোজই বাধে ঝগড়া। মাকে এসে থামাতে হয়। মা যে কি বলবেন—দু ভাই তা ভালভাবেই জানে। যে ব্যাট করছে—বেনিফিট অফ ডাউট সেই পাবে। মার একই কথা। তবু ঝগড়া থামাতে মাকেই রোজ ডাকা চাই। মা আসবেন। সব শুনে, নিজের মতামত দিয়ে ফিরে যাবেন। তারপর আবার শুরু হবে খেলা। এবং একটু পরে ঝগড়াও।

ছেলেবেলার গল্প

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

অস্ট্রেলিয়ার মস্ত শহর এডিলেড। তারই শহরতলী। খাশা জায়গাটা। বাড়িগুলো দূরে দূরে। প্রত্যেকটা বাড়ির সঙ্গে বাগান আছে। খানিকটা করে ফাঁকা জায়গা আছে। আর আছে অনেক গাছ। সবুজ ঘাস। আসলে শহরতলীর ঐ অঞ্চলটা তখন সবে গড়ে উঠছে। তাই অতো ফাঁকা ফাঁকা।

সেখানেই চ্যাপেলদের বাড়ি। বাবা, মা আর চার বছরের ইয়ান। বাবার সঙ্গে খেলার মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ায় ইয়ান। ওর বাবা ক্রিকেট খেলেন, ফুটবল খেলেন, বেসবলও খেলেন। বাবা যেখানেই খেলতে যাবেন—ইয়ান সঙ্গে যাবে। বসে বসে খেলা দেখবে। বাবার মত সেও সব কিছু খেলতে চায়।

বাড়িতে থাকলেই ইয়ান তার ব্যাট বগলে করে হাতে বল নিয়ে চলে যেতো বাড়ির পেছনের ফাঁকা জায়গায়। সেখানে শুরু হত ওর খেলা। ব্যাট দিয়ে বল মারা। বাড়ির পেছনে লেগে বলটা ফিরে আসতেই আবার মার। এইভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে একা একা খেলতো।

সময় পেলেই ইয়ান চলে যেতো ওর দাদুর কাছে। দাদু ওর স্বপ্নের মানুষ। ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপ্টেন ছিলেন। ফুটবল আর বেসবলে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দলের নেতৃত্ব করেছেন। দাদুর (ভিক্টর রিচার্ডসন—ইয়ানের মার বাবা)

ইয়ান চ্যাপেল

যেমন সব খেলার দিকে ঝোঁক ছিল। ইয়ানেরও তেমনি। ক্রিকেট খেলছে, ফুটবল খেলছে, বেসবলও খেলছে। দাদু চাইতেন ওঁর নাতী সব খেলাই খেলুক। তাই শুনে বাবা হাসতেন। বলতেন, ইয়ানটা ঠিক ওর দাদুর মত হচ্ছে।

ইয়ানের ভাই হয়েছে। আনন্দে ও লাফাচ্ছে। এতো-দিনে ওর একজন খেলার সঙ্গী জুটলো।

পাঁচ বছরের ছোট গ্রেগের সঙ্গে। কিন্তু ইয়ানের মোটেই বনিবনা হতো না। সব সময়ই দুজনের মধ্যে রেষারেষি। খেলার সময় ঝগড়া তো লেগেই থাকতো। রোজ দুভাইয়ের টেস্ট ম্যাচ হতো আর আউট নিয়ে ঝগড়া। ওদের মাকে ছুটে এসে থামাতে হতো। আরো পাঁচ বছর পরে ওদের তৃতীয় ভাই ট্রেভর হল। ইয়ানের থেকে ট্রেভর দশ বছরের ছোট। গ্রেগের থেকে পাঁচ। একটু বড় হতেই ট্রেভরও ওদের সঙ্গে নেমে পড়তো মাঠে। তিন ভাইয়ের ঝগড়া লেগেই আছে। ইয়ান সব সময় ছোট ভাই ট্রেভারের দিকে। এক-দিকে ইয়ান আর ট্রেভার। অন্যদিকে গ্রেগ। এইভাবে তিন ভাই বড় হতে লাগলো। কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে স্কুলে যাচ্ছে। লেখাপড়া, খেলা আর নিজেদের মধ্যে হৈচৈ করেই চ্যাপেল ভায়েদের জীবন তখন দিব্যি কেটে যাচ্ছে।

ওরা যখন নিজেদের মধ্যে খেলতো দাদু কিন্তু কখনোই সামনে আসতেন না। একটা গাছের আড়ালে গাড়ি রেখে উনি দিব্যি তিন নাতির ক্রিকেট খেলা দেখছেন। হঠাৎ হয়তো মা হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির। এই তোরা দাদুকে দেখেছিস ওরা কোথা থেকে দেখবে? ওরা তো খেলছে!

সব থেকে মজা হত স্কুল ক্রিকেটে ইয়ান ভাল রান করলে। দাদু ফোন করতেন। ইয়ান ফোন তুলতেই ভেসে আসতো দাদুর গলা, কনগ্রাচুলেশনস, ইউ প্লেড ওয়েল।

ইয়ান মুখ খোলার আগেই দাদু ফোন নামিয়ে রাখতেন।

বাবা বাড়িতে থাকলে তো আর কথা নেই। চারজনে মিলে চলতো ক্রিকেট খেলা। ট্রেভরের তখন দু-তিন বছর বয়েস বাবা শক্ত ক্রিকেট বল জোরে ছুড়ে দিতেন। আগে ইয়ান আর গ্রেগের বেলায়ও একই ঘটনা ঘটেছিল। ফলে তিন ভাইয়ের ভয় ডর বলে কিছু ছিল না। বাবাই ওদের মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, হাতে ব্যাট থাকতে আবার ভয় কিসের।

তখন ইয়ানের এগারো কি বারো বছর বয়েস। প্রিন্স আলফ্রেড কলেজের স্কুলে পড়ে। খেলে ১৩ বছরের কম বয়স্কদের দলে। প্রত্যেক শনিবার সকালে ওদের স্কুলে খেলার পর ইয়ান চলে যেতো ওর বাবার কাছে। মার্টিন চ্যাপেল অনেক তরুণ খেলোয়াড় নিয়ে ক্লাবের সি গ্রেড দলে খেলাচ্ছেন। নিজেও তাদের সঙ্গে খেলছেন। ইয়ান ক্রিকেট খেলোয়াড়ের পোশাকেই সেখানে হাজির হতো। খেলা দেখতো। শিখতও অনেক কিছু।

সেদিন তো এক কান্ডই ঘটে গেলো। ওয়েস্ট টরেনসের সঙ্গে মার্টিনের দলের খেলা।

মার্টিন চ্যাপেলরা আগে ব্যাট করে তিনশর ওপর রান করে ফেলল। ওয়েস্ট টরেনস খেলতে নেমেই উইকেট হারাচ্ছে। শেষকালে ওদের ক্যাপ্টেন এসে অবস্থা সামলে নিলেন। কিন্তু ভদ্রলোকের বড় বদ অভ্যেস। ডিফেনসিভ খেলার পরই পিচ ছেড়ে এগিয়ে এসে উইকেট ব্যাট দিয়ে ঠোকেন। বারবার তাই করছিলেন। মার্টিন তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, এরকম করলে কিন্তু তোমায় রান আউট করে দেওয়া হবে। ক'য়েকটা বল খেলার পর তিনি একটা বল কভারের দিকে ঠেলে দিয়ে পিচ ঠুকতে বেরিয়ে গেলেন। কভারে যে ছিল সে বল ছুঁড়ে উইকেটে মারলো। উইকেট ভেঙ্গে যেতেই মার্টিনরা সকলে মিলে চিৎকার করে উঠলেন 'হাউজ দ্যাট'। আম্পায়ার আউট দিয়ে দিলেন। প্যাভেলিয়নে ফিরে এসে রাগে গজরাতে লাগলেন ভদ্রলোক। ইয়ান স্কোর লিখছিল। তার পাশে দাঁড়িয়ে তিনি চিৎকার করছেন, মার্টিন আসুক না মাঠ ছেড়ে—মেরে ফেলে দেবো ওকে লাস ফেলে দেবো। আরো কতো কি! ভয়ে ইয়ান কাঁপছে—। বাবার জন্যে চিন্তা হচ্ছে। আবার ভাবছে, ও যে মার্টিনের ছেলে তা জানতে পেরে ওকেই না মেরে বসেন ভদ্রলোক। শেষ পর্যন্ত ওঁরই দলের একজন ওঁকে থামিয়ে দিল। বুঝিয়ে দিল, দোষটা ওঁরই।

তারপরই একদিন ইয়ান সি গ্রেড দলে খেলার সুযোগ পেয়ে গেল। নয় না দশ রান করলো সে। কিন্তু খুশি হয়েছিল অন্য কারণে। প্রতিপক্ষ দলে একজন সত্যিকারের ফাস্ট বোলার ছিলেন। তাঁর প্রত্যেকটা বল পেহনে গিয়ে গিয়ে খেললো ইয়ান। মনে মনে তাই সে বেশ খুশি।

কিন্তু রাত্তিরে খাবার টেবিলে বাবা বললেন অন্য কথা। বললেন, তুমি এখনো সি, গ্রেড দলে খেলার মত হওনি। ফাস্ট বোলারদের বলের লাইনে গিয়ে খেলতে পারছো না। আরো তৈরি হতে হবে তোমাকে।

বাবার কথা শুনে দারুণ নিরাশ হল ইয়ান! একটু দুঃখও পেল। সেই সঙ্গে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো, ভাল খেলে বাবাকে দেখিয়ে দিতে হবে তার যোগ্যতা।

সময় পেলেই মার্টিন সাহেব ছেলেকে খেলা শেখাতেন। ছোটরা যেমন ভালোবাসে ইয়ানও তেমনি উঁচু করে বল মারতে খুব ভালোবাসতো! ঐভাবে মারলেই বাবার কাছে বকুনী খেতো। তবু মাঝে মাঝে লোভ সামলাতে পারতো না। ঐভাবে মেরে বসতো। প্রত্যেক রবিবার সকালে

(এর পর ২৯ পাতায়)

যোগাসন

যোগী

(৪) **বকাসন ঃ** হাঁটু মুড়ে দু'পায়ের পাতার ওপর বসো। লক্ষ্য রাখবে পাছা যেন মাটিতে না লাগে। এবারে দুহাতের তালু মাটিতে রেখে পায়ের আঙ্গুলের ওপর শরীরের ওজন রেখে বসো। দুপায়ের বুড়ো আঙ্গুল এবং গোড়ালী কিন্তু জোড়া থাকবে। এই অবস্থায় হাতের উপরিভাগের পেছন (Tricep) দিয়ে দুটো হাঁটু যতদূর সম্ভব পিঠের উপর দিকে নিয়ে যাও। এই অবস্থায় লক্ষ্য রাখতে হবে। দু'পায়ের পাতা যেন জোড়া থাকে। এবারে হাতের জোরে শরীর মাটি থেকে যতটা সম্ভব উপরের দিকে তোলো। এই অবস্থায় ঘাড় তুলে মেরুদন্ড সোজা রেখে ছবির মত সামনের দিকে তাকাও। পায়ের গোড়ালী পাছার সঙ্গে লেগে থাকবে এবং পায়ের আঙ্গুল নীচের দিকে রেখে লক্ষ্য রাখবে পায়ের পাতা এবং আঙ্গুল যেন মাটি স্পর্শ না করে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। ৩/৪ বার অভ্যাস করো। তারপর ১ মিনিট শবাসনে বিশ্রাম করো।

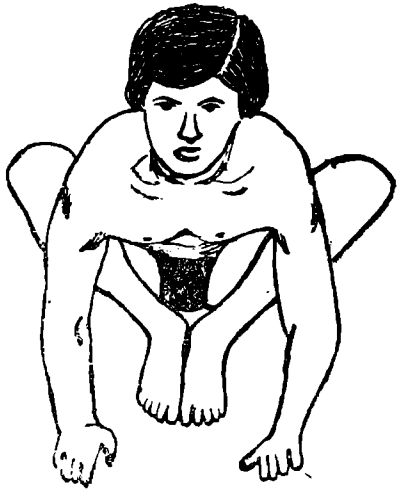

বকাসন

উপকারিতা ঃ এই আসনে হাত, কাঁধ ও পেটের মাংসপেশীর ক্ষমতা বাড়ে। ফলে হাতের শক্তি বাড়ে, কাঁধের হাতের ও পেটের সাধারণ ব্যথা দূর হয়। হজমশক্তি বাড়ে। মেরুদন্ড নমনীয় হয়।

(৫) **বদ্ধ পদ্মাসন ঃ** প্রথমে পদ্মাসনে বসো। এবারে ডান হাত পেছন দিক দিয়ে ঘুরিয়ে (অর্থাৎ পিঠের ওপর দিয়ে) ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুল ধরো। তারপর বাঁ হাত পেছন দিক দিয়ে ঘুরিয়ে ঐ একই ভাবে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙ্গুল ধরো। এবারে ছবির মত বুক টান করে সোজা হয়ে বসো। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এই অবস্থায় ২০/৩০ সেকেন্ড থাকো। তারপর পদ্মাসনের মত পা বদলে পুনরায় করো। এই আসন করার সময় চিবুক কণ্ঠকূপে নিবদ্ধ রেখে নাকের মাথার দিকে তাকাবে। নাকের মাথার দিকে তাকালে যদি মাথায় যন্ত্রণা বা অস্বস্তি বোধ কর তাহলে, নাকের মাথার দিকে না তাকিয়ে ভ্রূমধ্যে বা হৃদয়ে তাকাতে পারো।

এই আসনের পর ১ মিনিট শবাসনে বিশ্রাম করো।

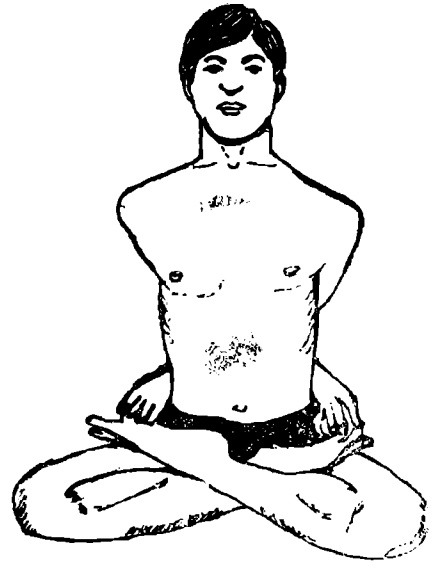

বদ্ধ পদ্মাসন

উপকারিতা ঃ বাত ভালো হয়। কণ্ঠার হাড় উঁচু থাকলে নীচু হয়। বাঁকা মেরুদন্ড সোজা হয়। হাঁপানী রোগ সারাতে সাহায্য করে। কাঁধ ছোট থাকলে তার সমতা আনে।

(৬) **অর্দ্ধ বদ্ধ পদ্মাসন ঃ** দুপা সামনে ছড়িয়ে সোজা হয়ে বসো। এবারে বাঁ পা হাঁটু মুড়ে ডান উরুর ওপর রাখো। বাঁ হাত পেছন দিক দিয়ে ঘুরিয়ে বদ্ধ পদ্মাসনের মত বাঁ পায়ের বুড়ো আঙ্গুল ধরো। এবারে ডান হাত দিয়ে সামনের দিকে ছড়ানো ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুল ধরো।

এই অবস্থায় শ্বাস ছেড়ে তলপেট ভেতর দিকে টেনে ছবির মত মাথা ডান হাঁটুতে লাগাও। প্রথম প্রথম এই অবস্থায় ডান হাঁটু মাটি থেকে একটু ওপরে উঠলে খুব একটা ক্ষতি হবে না। এই অবস্থায় ৩০ সেকেন্ড থেকে ১ মিনিট থাকো। এরপর পা এবং হাত পরিবর্তন করে (অর্থাৎ ডান পা মুড়ে বাঁ উরুর ওপর রেখে ডান হাত পেছন দিয়ে ঘুরিয়ে ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুল ধরো। তারপর সামনে ছড়ানো বাঁ পায়ের বুড়ো আঙ্গুল বাঁ হাতে ধরো) আগের মত করো। হাত, পা পরিবর্তন করে ৪ বার করো। এই আসনে থাকাকালে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখবে। শেষে ১ মিনিট শবাসন করো।

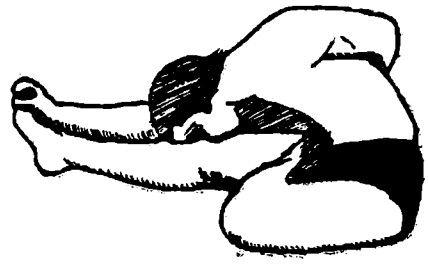

অর্দ্ধ বদ্ধ পদ্মাসন

উপকারিতা ঃ খিদে বাড়ে এবং সায়টিকা প্রভৃতি সব রকমের কটি বাত সারে।

(২৭ পাতার শেষাংশ)

লিন ফুলারের কাছে খেলা শিখতে যেতো। উনিও মার্টিন সাহেবের মত একই কথা বলতেন। তারপর ধীরে ধীরে ও নিজেকে সামলে নিলো। ফুলার সাহেবই ইরানের ব্যাটিংয়ের ধারা বদলে দিলেন।

ইয়ান সাউথ অস্ট্রেলিয়ার ১৪ বছরের কম বয়স্কদের স্কুল দলে মনোনীত হল সেবার। খেলতে লাগলো একটার পর একটা ম্যাচ। সেন্ট লেনার্ড প্রাইমারী স্কুল থেকে ইয়ান চলে এল প্রিন্স আলফ্রেডে। সেই স্কুল থেকে ঐ কলেজেই। ক্যাপ্টেন হলো সে।

স্কুল আর কলেজের খেলায় বড় বড় স্কোর করে ইয়ান আস্তে আস্তে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেললো। গ্রেগ আর ট্রেভারও দিব্যি খেলছে। চ্যাপেল ভায়েরা তখন দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার ছোটদের মধ্যে সাড়া জাগানো নাম।

১৯৬১-৬২ সালে ইয়ান প্রথম দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দলের পক্ষে খেলার জন্যে মনোনীত হল। করলো ৬০ রান। পরের খেলা ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে। করলো ৭০ আর ১৫০ রান। তখন ইয়ানের বয়েস ১৭-১৮। তারপর থেকে তাকে আর পেছনে তাকাতে হয় নি। সাফল্য এল একের পর এক। অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় দলে স্থান পেয়েছে। অধিনায়ক হয়েছে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার। তারপর দাদুর মত অস্ট্রেলিয়া দলের···।

অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক টেস্ট ক্রিকেটের আসর থেকে সরে গেছেন। কিন্তু আজো তাঁর চোখের সামনে ভাসে ছোটবেলার হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো। বাড়ির পেছনে একা একা খেলা। গ্রেগের সঙ্গে ঝগড়া। দাদুর সঙ্গে খেলা দেখতে যাওয়া। বাবার কাছে বকুনী খাওয়া আরো কতো কি। ইয়ানের চোখের ঘোর দেখে গ্রেগ বুঝতে পারে দাদা কি ভাবছে। তখন হেসে ওঠে দুই ভাই। ধারে কাছে ট্রেভর থাকলে সেও ছুটে আসে।

বিশ্বরেকর্ড

ঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

খুব দ্রুত শসা কাটার বিশ্বরেকর্ড করেছেন ইংল্যাণ্ডের ক্ল্যাকপুল কলেজ অব আর্ট অ্যাণ্ড টেকনলজির ছাত্র নরম্যান জনসন ; বি, বি, সির 'রেকর্ড ব্রেকার্স' অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে শ্রীমান্ ১২ ইঞ্চি লম্বা ও ১½ ইঞ্চি ব্যাসের একটি শসাকে ২০ টুকরো করে ফেলেন ২৪.২ সেকেন্ডের মধ্যে ; প্রত্যেকটি টুকরো ছিল সমান মাপের ! (২৮. ৯. ১৯৭৩)

এক নাগাড়ে ৪১৫২½ ঘন্টা বা ২৪ সপ্তাহ ৫ দিন নৃত্য করার রেকর্ড দু'জন মার্কিন তরুণ তরুণীর তাঁদের নাম টনি অলটোরির ও ভেরা মিকাস ; মার্কিন দেশের পিট্স-বার্গের মোটর স্কোয়ার গার্ডেনে ৬. ৬. ১৯৩২ থেকে ৩০, ১১. ১৯৩২ তারিখ পর্যন্ত ঐ 'ম্যারাথন' নৃত্য প্রতিযোগিতা চলেছিল; বিজয়ী জুটি ১০০০ ডলার পুরস্কার পান।

কয়লার বস্তা বয়ে নিয়ে যাওয়ার রেকর্ড ইংল্যান্ডের ব্রায়ান নিউটনের ; তিনি ১২. ১১. ১৯৭৬ তারিখে ১১২ পাউন্ড কয়লা বোঝাই এক বস্তা ২২.২ মাইল (লাইচেস্টার থেকে বিয়ার্সবাই পর্যন্ত, যাতায়াত, ৬ ঘণ্টা ৭ মিনিটে) বয়ে নিয়ে যান !

ধাঁধা

জ্যেষ্ঠ : এক্সেসি

নরেনের আরও একটা শান্টিং সমস্যার কথা বলছি এবার। একটা লাইনে তিনটে ওয়াগন আর দুটো ইঞ্জিন দাঁড়িয়ে আছে, প্রথমে ওয়াগন, তারপর ইঞ্জিন, তারপর আবার ওয়াগন—এই ভাবে (ছবি দেখ)। নরেনের কাজ হচ্ছে ওয়াগনগুলোকে পাশাপাশি আর ইঞ্জিন দুটোকে পাশাপাশি করে রাখা, যাতে সাজানোটা হয় W W W E E অথবা E E W W W এই রকম। শান্টিংএর জন্য দু নম্বর লাইনটিকে ব্যবহার করা যাবে। এক নম্বর থেকে দুনম্বর লাইনে যাওয়ার জন্য অনেকগুলো 'ক্রস' লাইনে পাতা আছে।

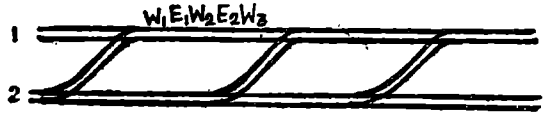

শান্টিং এর সর্ত আছে একটা। এক লাইন থেকে অন্য লাইনে যাওয়ার সময় প্রত্যেক ইঞ্জিন একটা মাত্র ওয়াগন সঙ্গে নিয়ে যাবে, তার বেশীও নয়, কমও নয়।

বল দেখি,—এই সর্ত মেনে ওয়াগন আর ইঞ্জিন দুটোকে নতুন ভাবে সাজানো কি সম্ভব ?

চৈত্র মাসের ধাঁধার উত্তর

১। রূপা মঞ্জুলিকার ব্যাগে একটা বই বা খাতায় হাত দেবে। সেটাতে মলাট না থাকলে সেগুলোই অনুরাধার বই খাতা। আর থাকলে সেগুলো অনীতার ; অনুরাধার বই খাতা অনীতার ব্যাগে।

২। ভদ্রলোকের সঙ্গে মহিলারা ছিলেন। তিনি দেখছিলেন, বাসে 'লেডীজ' সীটে পুরুষেরা বসে আছেন।

ইচ্ছে.....!

নরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রাজকন্যার চোখের অসুখ দু'টো পাতাই বন্ধ
সবাই বলে, "মেয়েটা কি হবেই তবে অন্ধ !"
বদ্যি এলো হাকিম এলো দেশবিদেশের থেকে
মলিন মুখে ভাবতে থাকে সবাই রুগী দেখে।
কেউ পারে না চোখ সারাতে সবারই মুখ চুণ
রাজা ভাবেন, কারোরই নেই রোগ তাড়াবার গুণ।
—"সব ব্যাটারই গর্দান লা'ও" রাজার হুকুম জারি
রাজকন্যা শুনে ভাবে দোষটা আসল তারই।
হঠাৎ রোগের ভান করলে কেমন সাড়া পড়ে
তাই দেখতে দু'চোখ বুঁজে শুয়ে ছিল ঘরে।
রাজকন্যা বুঝলো বটে তারই খেয়াল বশে
রাজ্য জুড়ে হাকিম-বদ্যি পড়ল রাজার রোষে।
এই কথাটি ভেবে কন্যা চক্ষু দুটি খোলে
—"রোগ সেরেছে এই তো মেয়ের" সবাই হেসে বলে।
"কেমন করে হোলো এটা করলে কে চিকিচ্ছে ?
রাজকন্যা হেসে বলে "ইচ্ছে—ইচ্ছে—ইচ্ছে।"

যাদের একটির উত্তর ঠিক হয়েছে :

অমিত ও রুমা রায়—চাইবাসা, সিংভূম। অনুপম দাশশর্মা—বেলেঘাটা, কলকাতা ১০। অরুণাভ পাঁজা—ভাদুর, হুগলী। অসীম, সুমিতা, বাপী ও গণেশ দাদু—বেলিয়াতোড়, বাঁকুড়া। তাপস বণিক—চিত্তরঞ্জন টাউনশিপ ৪১, বর্ধমান। বিদ্যুৎ কুমার ধোলে—বালিগোড়ী, হুগলী। সুভাষ মুখোপাধ্যায় (গ্রা, ১০৪৬)—গোপালমাঠ, বর্ধমান। স্বপন ও মায়া ঘোষ—বাঁশদ্রোনী, ২৪ পরগণা।

(এর পর ৬২ পাতায়)

কাগজের সারু গাছ

মঞ্জুদি

এস এবার একটা সারুগাছ তৈরি করি। যত রকম রঙ চাও, ততগুলি রঙীন কাগজ একত্রে পাকিয়ে নাও প্রথমে।

নিয়েছ আচ্ছা এইবার পাকানো কাগজের রোলটায় দু জায়গা লম্বালম্বিভাবে কাটো প্রথম ছবির মত।

কাটার পর এইবার দ্বিতীয় ছবির মত রোলটাকে তিন-ভাগে ভাঁজ করে ফেলো।

তারপর? তৃতীয় ছবির অনুকরণে মাঝের রোলটা আড়াআড়িভাবে কেটে ফেলো।

কেটেছ? এইবার কি করতে হবে বলত? চতুর্থ ছবির দিকে তাকাও। হ্যাঁ, ভাঁজটা খুলে ফেলতে হবে।

হ্যাঁ, এইবার পঞ্চম ছবির দিকে দেখ। ওই ভাবেই রোলটাকে ভাঁজ করতে হবে এবং ভাঁজের মধ্যের অংশটা টানতে হবে।

টেনেছ এইবার ষষ্ঠ ছবির মত এটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দাও।

এইবার দেখতো, সপ্তম ছবির মতই তোমার তৈরি সারু গাছটা এমন নিখুঁত হল কিনা নিশ্চই হয়েছে। যত্ন করে করলে না হবার কোনও কারণ নেই।

তোমার ভাইবোন বা তোমার যদি প্রিয়বন্ধু থাকে তাকে এটা উপহার দাও।

স্কুলে ওয়ার্ক এডুকেশন ক্লাশেও দেখাতে পার। কে জানে একটা 'GOOD' অপেক্ষা করছে কিনা তোমার জন্য

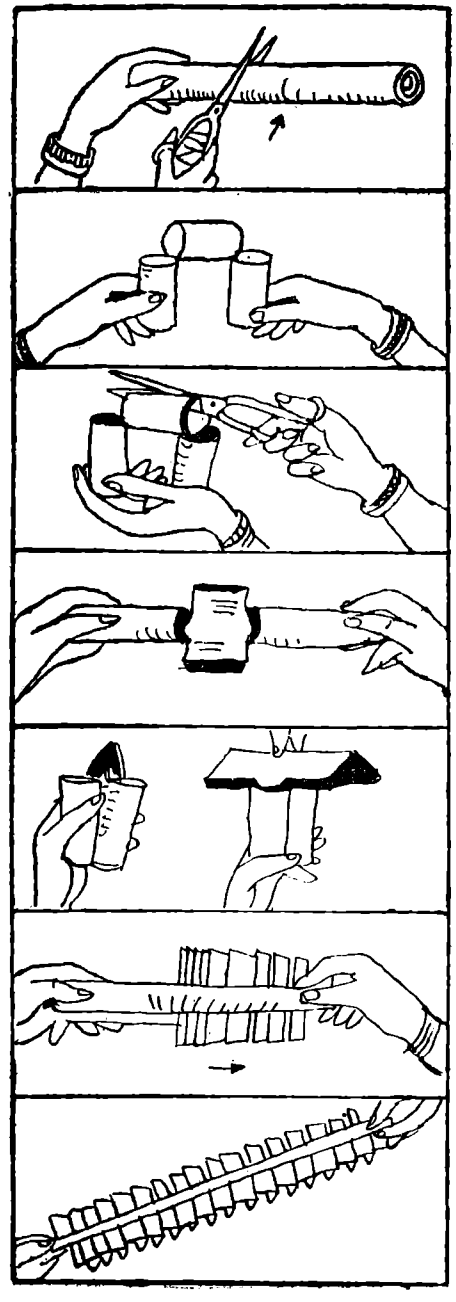

ভেবে ভেবে সমাধান

সব সূত্রই সহজ নয়। না পারলে বড়দের সাহায্য নিতে হবে। এটি তৈরি করেছেন

শাব্দিক

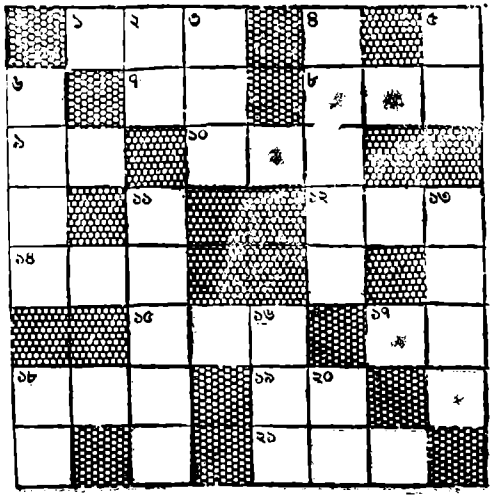

পাশাপাশি :

১ বিমল ঘোষের ছদ্মনাম, ৭ প্রাচীন মাগধীভাষা, ৮ উৎসব, ৯ সম্পদের দেবী, ১০ বধ্যভূমি, ১২ কথার ফোড়ন, ১৪ পায়চারি, ১৫ অতিলোভী, ১৭ জল, ১৮—পরমং তপঃ, ১৯ যে উদ্ভিদ আশ্রয় ছাড়া খাড়া হয়ে উঠতে পারে না, ২১ লিখবার কাজে লাগে।

উপর-নীচ :

২ পরিমাপ করা, ৩ তামাকের কলকে, ৪ অখিল নিয়োগীর ছদ্মনাম, ৫ মৃতদেহ, ৬ সমরেশ বসুর ছদ্মনাম, ১১ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম, ১৩ নির্বিঘ্ন, ১৬ চোখের পাতা, ১৮ কোকিল, ২০ ছন্দ।

চৈত্র মাসের ভেবে ভেবে সমাধানের উত্তর

পাশাপাশি :

১ বেহালা, ৭ বাহু, ৮ সরব, ৯ পরী, ১০ ললনা, ১২ হায়েনা, ১৪ সকাল, ১৫ তস্কর, ১৭ পীত, ১৮ সাগর, ১৯ টক, ২১ নাটিকা।

উপর-নীচ :

২ হাবা, ৩ লাহুল, ৪ হাসনাহানা, ৫ রব, ৬ উপন্যাস, ১১ জলতরঙ্গ, ১৩ নাকতলা, ১৬ রটনা, ১৮ সাদা, ২০ কটি।

নির্ভুল উত্তরদাতা :

অসীম, সুমিতা ও গণেশ দাদু—বেলিয়াতোড়, বাঁকুড়া। অপূর্ব, সৌমিত্র ও তপন ভট্টাচার্য—কলকাতা ৩৩। অঞ্জনা দেব (গ্রা, ৬৫০)—কলকাতা ৫। কুহু ও কেকা ভট্টাচার্য—সিঙ্গুর, হুগলী। তাপস, শ্রীকান্ত, টিংকু, অর্চনা, অসীমা, করুণা, কাকা এবং বিদ্যুৎ কুমার ধোলে—বালিগোড়ী, হুগলী। পিউ, পাপু, ছং, শ্রাবনী মুখোপাধ্যায়, টিংকু, বুনু, রবীন, অমর ও বেলা চট্টোপাধ্যায়, তৃষ্ণা ও আশিস ঘোষ, পুরণিমা ও শান্তিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সগড়াই, বর্ধমান। শুভ, মৌ ও মা—হাইলাকান্দি, কাছাড়। শুভেন্দু, পূর্ণেন্দু, দিব্যেন্দু ও কেকা দাস—মঠের দীঘি, ২৪ পরগণা। সোনালী, সেতার, সন্তুর সেন, বাবা ও মা—কৃষ্ণনগর। হিল্লোল দাস—ঠিকানার উল্লেখ নেই। হরেকৃষ্ণ, মনোরমা, মদনমোহন, বিদ্যুৎ রানী ও দীপ্তিরানী সামন্ত—বিজয়গড়, যাদবপুর।

(৬০ পাতার শেষাংশ)

(ধাঁধা) যাদের দুইটি উত্তরই নির্ভুল হয়েছে :

অঞ্জনা দেব (গ্রা, ৬৫৩)—কলকাতা ৫। কনকঠাকুর, জয়ন্ত মজুমদার, অতুল সন্ন্যাসী, পার্থ ও চন্দন ব্যানার্জী—বেথুয়াডহরী, নদীয়া। কুহু ও কেকা ভট্টাচার্য—সিঙ্গুর, হুগলী। পিয়ালী ও সোনালী ঘোষ—ক্যানিং। শনাদা, মৃনাল ও আশা মজুমদার, উমা ও রাণু দাস, শম্ভু বোস, মিঠু, সোমা ও মা, বাবা—দত্তবাগান, কলকাতা ৩৭। শুভেন্দু, পূর্ণেন্দু, দিব্যেন্দু, কেকা ও বাবা, মা—মঠের-দীঘি, ২৪ পরগণা। হরেকৃষ্ণ, মনোরমা, মদনমোহন, বিদ্যুৎ রানী ও দীপ্তিরানী সামন্ত—বিজয়গড় যাদবপুর। সাধনা, বাসনা, কল্পনা ও সত্যেন চক্রবর্তী, মানু—গোপালপুর, আসানসোল। ঝুমলা, টিনা ও লালু ভড়—কলকাতা ২৮।

তোমাদের পাতা

পাখিদের ঝগড়া

শুভাশিস্ বিশ্বাস

তিনটে চড়ুই ঝগড়া করে
ঘোষ বাবুদের চালে,
তাই না দেখে, চারটে কাকে
যোগ দিল সেই দলে।
চড়ুই কাকের ঝগড়াতে যেই
লেগেই গেল ধুম,
শালিক, টিয়ে কোকিল চিলের
ভাঙেই তখন ঘুম।
ঘুম ভাঙা সেই পাখীরা সব
যেমনি করে তাড়া,
ঝগড়া ফেলে পালায় সবাই,
ভয়েই পাগল পারা।

ছড়ায় রবীন্দ্রনাথ

প্রদোষ দত্ত

'শিশুভোলানাথ' পড়ছে 'শিশু'
'সহজপাঠে'র বোল,
শিল্পী জাদু গানের জাদু
আনল কত ভোল।
বিশ্ব জুড়ে উঠছে জেগে
বাংলা ভাষার গান,
রবি ঠাকুর রবি ঠাকুর
টাপুর টুপুর গান!

আমার কথা | **আমার ছবি**

খুশীর খবর

শোন, একটা দারুণ খুশীর খবর! তুমি যদি ছবি আঁকতে পার, তাহলে ৬ সি. এম. × ৬ সি. এম. একখানা সাদা ড্রয়িং পেপারে তোমার সবচেয়ে প্রিয় ছবিখানা চাইনীজ ইঙ্কের সাহায্যে এঁকে এখনি পক্ষিরাজের ঠিকানায় পাঠিয়ে দাও। আর সেই সঙ্গে পরিস্কার করে লেখ তোমার নাম, বয়েস, তুমি কোন স্কুলে পড়, কার কাছে ছবি আঁকা শেখ, কে তোমায় বেশী উৎসাহ দেয়, কখনও কোন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছ কিনা আর বড় হয়ে তুমি কার মত হবে।

তিনটে কথা

অরূপ দাস

কেউ যদি কোনোদিন
তিন কথা দিয়ে,
ছন্দের মিল করে
কথা সাজিয়ে।

এক হল সব পেয়ে
আছি হাসিখুশি।
দুই কথা সবাইকে
আমি ভালোবাসি।

তৃতীয়টা শেষ কথা
এবার জানাই—
এ জগতে সকলের
ভালোবাসা চাই॥

বলো তো ?

নীচে তিনজন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের নামের পাশে তিনটি করে খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের ছদ্মনাম দেওয়া হল। ঐ সাহিত্যিকের সঠিক ছদ্মনামের উত্তরদাতাদের নাম পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে। এতে অবশ্য তোমরা যারা সব সাহিত্যিকের ছদ্মনাম কি তা জাননা, তারা জানতে পারবে। উত্তর পত্রের ওপরে 'বলো তো কথাটি লিখবে।

১। **গন্ধর্বনারায়ণ মিত্র—দীনবন্ধু মিত্র/রায়-পড়ুয়া/লীলাবান।**

২। **চারুচন্দ্র চক্রবর্তী—জরাসন্ধ / লঘুগুরু / অজাতশত্রু।**

৩। **মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়—শঙ্কর / জাবালি /অভিনন্দ।**

চৈত্র মাসের 'বলো তো-র উত্তর

১। **বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—দর্পনারায়ণ পতিতুণ্ড।**

২। **দুলালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—অবধূত।**

৩। **সুবোধ ঘোষ—কালপুরুষ।**

পুতুল নাচ

শিবাশিস মুখোপাধ্যায়

আবছা আলোর রঙিন কাঁচ,
তাক্ ধিনাধিন্ পুতুল নাচ।

পুতুল নাচে নাচ পুতুল,
রাতুল রাজের পুতের তুল।

বন্ধু ওদের সিন্ধু-তীর
বন্ধু ওদের ধীর-সমীর,
মেঘমুল্লুকের রামধনুকের
সাতরঙা ঢেউ বন্ধু রে,

বন্ধু নিয়ে স্টেজ নাচিয়ে—
নেচেই চলে প্রাণ জুড়ে।

দোল দুলিয়ে মন ভুলিয়ে
তুর্কী নাচের চরকি পাক্,
সুতোর গেঁটে জড়িয়ে হেঁটে
কষ্ট ক'রে দাঁড়িয়ে থাক।

মিতুল নামের পুতুল কে
তুতুল সোনা দেখছে যে।
রাজসভা আর বনের সিন,
হঠাৎ হ'ল লোডশেডিং।
আলোর পরে অন্ধকার
চোখ দু'খানি বন্ধ কার ?
পুতুল নাচের রঙ সোনালী
হল্লা হ'ল শেষ.

ছোট্ট তুতুল পৌঁছে গেছে
স্বপ্ন-সবুজ সব পেয়েছির দেশ।

নির্ভুল উত্তরদাতা

কুহু ও কেকা ভট্টাচার্য—জলাপাড়া, সিঙ্গুর, হুগলী। জয়দীপ ও বনিসান সেনগুপ্ত—কলকাতা ৩৩। পূর্ণিমা ও শান্তিনাথ বন্দ্যোপাধায়, বেলা চট্টোপাধ্যায়—সগড়াই, শ্রীপল্লী, বর্ধমান। বিদ্যুৎ কুমার ধোলে—বালিগোড়ী, হুগলী। মমতা দে—কলকাতা ৫। মৃনাল, ও আশা মজুমদার, উমা, ও রাণু দাস, বাবা, মা—দত্তবাগান, কলকাতা ৩৭। সত্য নারায়ণ' বিশ্বাস—রাণাঘাট, নদীয়া।

অনিলকুমার করাতি কর্তৃক ৩৮বি সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা ৯ হইতে প্রকাশিত ও ফাইন প্রিন্টিং হাউস, ৩৮বি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত।

প্রিয় ছোট্ট বন্ধুরা,

তোমাদের প্রিয় লেখকদের লেখা দারুণ দারুণ কয়েকটা গল্পের বই খুব শিগগিরই আমরা তোমাদের উপহার দিচ্ছি ঃ

ঘনাদার হিজ্ বিজ্ বিজ্ প্রেমেন্দ্র মিত্র

রাজা মহাশ্বেতা দেবী

এক যে ছিল পায়রা সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

অর্জুনের এ্যাডভেঞ্চার কবিতা সিংহ

জাদুকর বসন্তনিবাস অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

লঙ সাহেবের বাঘ বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

লক্ষ্য সিংহাসন ধীরেন্দ্রলাল ধর

এছাড়াও লিখেছেন ঃ

নীহাররঞ্জন গুপ্ত ও আরও কয়েকজন তোমাদের প্রিয় লেখক।

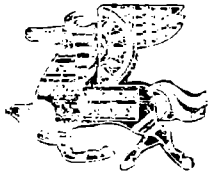

পক্ষিরাজ প্রকাশনী

৩৮বি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট

কলকাতা ৭০০০০৯

ফোন : ৩৪-৩১৪৬

P.M. ABRAI Regd. No WB/EC 165 RN No. 32844/78 Re. 1·00

সাকসেস পাবলিশিং
হাউসের

স্মরণীয় প্রকাশন

Edited by M. Karati

SUCCESS'S POCKET
DICTIONARY
(ENG. TO BENG.)

৫ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর উপযোগী
২২০০০ শব্দ সম্বলিত ১০০০ পৃষ্ঠার বই
Price - Rs. 10·00

SUCCESS'S CURRENT
DICTIONARY
(ENG - BENG & ENG.)

৫ম শ্রেণী হইতে ১২ শ শ্রেণীর শিক্ষার্থীর উপযোগী
২৪০০০ শব্দ সম্বলিত ১৩০০ পৃষ্ঠার বই
Price - Rs. 18·00

শ্রীঅনিল বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত
পূর্ণ কলেবর (পদ্যে)

সচিত্র সপ্তকাণ্ড
কৃত্তিবাস রামায়ণ

মূল্য রাজ সং ৩৬ টাকা
মূল্য সাধারণ সং ৩০ টাকা

— প্রাপ্তিস্থান —

সাকসেস্ পাবলিশিং হাউস
১ নং বিধান সরণী কলিকাতা-৭৩

উক্ত বইগুলি ক্রয়কালীন
পক্ষিরাজের গ্রাহকদের টাকায়
২৫ পয়সা ছাড় দেওয়া হবে।